আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার থ্রিলার

গ্রেট আনসল্‌ভ্‌ড ক্রাইম্‌স

লুইস সলোমন

অনুবাদ : মোস্তফা আরিফ

BanglaBook.org

১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম স্কলাসটিকা প্রকাশনী এ বইটি প্রকাশ করে। প্রকাশের এক বছরের মধ্যে দশ লাখ কপি বিক্রি হয়। বইটি নিয়ে সারাবিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

* লিজি বরডেন যদি তার বাবা-মাকে খুন না করে থাকে তাহলে কে এ অপকর্ম করেছে? যে কুড়াল দিয়ে খুন করা হল তা কোথায় হারিয়ে গেল?

* ৭২৭ বিমান ছিনতাইকারী ২০ হাজার ডলার নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল? ছিনতাইকারীর ভাগ্যে পরবর্তীতে কি ঘটেছিল?

* ছেলে অপহরণের পর বাবা 'ক্রিশ্চিয়ান কে রস' সন্তানের খোঁজে পাগল হয়ে যান, তিনি কেন সন্তানকে খুঁজে পেলেন না? গোয়েন্দারা কেন তাকে উদ্ধার করতে পারেনি, আর কি তার রহস্য?

এই তিনটি অপরাধ ছাড়াও আরো তিনটি ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যার কোন সমাধান করতে পারেনি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা। খুন, হত্যা, অপহরণ এসব সংঘটিত হলেও পুলিশ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এ অপরাধগুলির সমাধান অমীমাংসিত ও রহস্যই থেকে যায়। পৃথিবীতে আদৌ এ রহস্যের সমাধান হবে কিনা তা প্রশ্নই থেকে যায়!

www.BanglaBook.org

গ্রেট আনসল্‌ভ্‌ড ক্রাইম্‌স

লুইস সলোমন

অনুবাদ : মোস্তফা আরিফ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মুক্তদেশ প্রকাশন

গ্রেট আনসলভ্ড ক্রাইমস্

লুইস সলোমন

(অপরাধ বিষয়ক থ্রিলার)

অনুবাদ : মোস্তফা আরিফ

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৪

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রকাশক
জাবেদ ইমন
মুক্তদেশ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং (২য় তলা), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১২৬৭১৩৪৬, ০১৬৭৫০০৭২২৯
e-mail: Muktodesh71@gmail.com

প্রচ্ছদ
অনন্ত আকাশ

অক্ষর বিন্যাস
ইমন কম্পিউটার, ১১ বাংলাবাজার -ঢাকা

মুদ্রণ
মেসার্স আল ফয়সাল প্রিন্টার্স, শ্রীশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য
২০০ (দুইশত টাকা মাত্র)

আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক। যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন ও রূপসী বাংলা, ২২০ টুটিংহাই স্ট্রিট, লন্ডন।

ISBN : 978-984-8689-97-4

Great unsolved crimes by Louis Solomon, Published by Jabed Imon, Muktodesh Prokashan, Islami Tower (2nd Floor), Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh. Date of Publication: February 2014. Price : Tk 200.00 U. S. $ 4.00

অনুবাদকের
উৎসর্গ

আমার প্রিয় কন্যা
সারাহ্ তাসনিম রাইসা

লেখকের কথা

সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এ কাহিনী কতটা অবাক লাগবে তা জানি না তবে আমার নিজের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। এ বইয়ের প্রতিটি গল্প যেমনি লোমহর্ষক তেমনি সত্য। কাহিনীগুলো আমি যখন জানতে পারলাম, তখন থেকেই মনে হচ্ছিল এগুলো প্রকাশ করব। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হয়েছে।

অপরাধ জগতের মানুষেরা এত নিখুঁতভাবে কাজ করতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। অপরাধ জগতের এসব মানুষ কিভাবে নিজেদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখে এটাই তার বড় প্রমাণ। অনেকেই ব্যক্তিগত অভিমত পোষণ করে বলেন, অপরাধী যত বড়ই হোক না কেন কোথাও না কোথাও ভুল সে করবেই। কিন্তু এ বইয়ের ছয়টি কাহিনী আজও রহস্য থেকে গেছে। সারা পৃথিবীর সেরা গোয়েন্দারা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেছে। তারা কোন সমাধান করতে পারেনি। রহস্যের কোন কুল-কিনারা পাওয়া যায়নি।

আমার কাছে প্রতিটি কাহিনী অলৌকিক ব্যাপার মনে হয়েছে। এর উৎস কোথায় আর শেষই বা কোথায় তা আমার জানা নেই।

বিমান ছিনতাইকারী ডি.বি. কুপারের শেষ পরিণতি জানা যায়নি। রহস্যের জট খোলেনি সার্জরা রবিনস্টোনের হত্যা রহস্য। ব্রুকলিন জাদুঘর থেকে শিল্পকর্ম চুরি ও ছিনতাই কেমন করে হল তা কেউই বলতে পারেনি। পিকিং ম্যান পৃথিবী থেকে কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল তা বিস্ময় নয় কি? সবচেয়ে হতবাক হয়েছি মা এবং বাবা হত্যার কাহিনী শুনে। অ্যাবি এবং এন্ড্রু বরডেন কিভাবে খুন হলেন তা চিরকাল অন্ধকারেই থেকে গেল। ছোট্ট মেয়ে লিজিকে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হয়েছিল। কিন্তু সে নির্দোষ প্রমাণিত হয়। মুক্তি পেল। তাহলে অপরাধী কে? এর কোন হদিস মিলল না।

প্রতিটি কাহিনী মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। একথা ঠিক হয়তো এ গল্পগুলো যারা পড়বে তারাও চিন্তা করবে কেন এমন হল। যেহেতু প্রতিটি কাহিনীর সময়কাল প্রায় ১৫০ বছর পার হয়ে গেছে তাই প্রমাণ করার আর সুযোগ নেই। কাহিনীর নায়ক বা খলনায়ক কেউই আজ আর এ নশ্বর পৃথিবীতে বেঁচে নেই। তাই এ গ্রন্থের প্রতিটি কাহিনী রহস্যময় থেকে গেল। সে জন্যই বলা যায় বইটির নাম 'গ্রেট আনসলভ্ড ক্রাইমস্'

লুইস সলোমন

লেখক

অনুবাদকের কথা

এ পৃথিবীতে কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে, তার যেন কোন শেষ নেই। অপরাধ জগতেও বহু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। এমন অপরাধ কাহিনী রয়েছে যা শুনলে রীতিমত চমকে উঠবে সবাই। সারা শরীর শীতল হয়ে উঠবে।

পৃথিবীতে বহু অপরাধের সমাধান করা যায়নি। রহস্যই থেকে গেছে। বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দারা পারেননি সেসব অপরাধের কোন কূল কিনারা করতে। যুগের পর যুগ এমনকি শত বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু রহস্যের জট খোলেনি। মানুষ বিস্মিত হয়েছে। তাহলে অপরাধীরা কি এতটাই ক্ষমতাধর? রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর সংস্থা, পুলিশ, গোয়েন্দার ও আইন বিভাগ কি তাদের কাছে এতটাই দুর্বল এ প্রশ্নই জেগে উঠে?

যুক্তরাষ্ট্রে এমন ছয়টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যা শত বছর পরেও কোন সমাধান হয়নি। কুখ্যাত এসব অপরাধের নায়ক বা খলনায়ক কে তাও উন্মোচিত হয়নি। একট পর্যায়ে সাধারণ মানুষ এসব কাহিনী ভুলে গেছে। মাঝে মধ্যে যখন কেউ স্মরণ করে তখন অনেকেই অবাক হয়।

বিশ্বখ্যাত লেখক এবং টেলিভিশনের প্রোগ্রাম পরিচালক লুইস সলোমন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এ ছয়টি অপরাধের কথা তার বই **গ্রেট আনসলভ্ড ক্রাইমস্**-এ তুলে ধরেছেন। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ে তিনি এ বইটি ছোট্ট আকারে প্রকাশ করেন। তার এ বই যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা পৃথিবীতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

প্রথম কাহিনীটি ছিল বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা। অত্যন্ত লোমহর্ষক সেই ছিনতাইকারীর শেষ পর্যন্ত কি পরিনতি হয়েছিল তা জানা যায়নি। ছিনতাইকারী ডি.বি. কুপার রহস্যের অতলে রয়ে গেলেন চিরকাল। মার্ডার অন ফিফথ এভিনিউ গল্পে সার্জ রবিনস্টোনের মৃত্যুর কারণ জানতে পারেনি কেউ। দি টেন হান্ড্রেড মাস্টারস গল্পে ১৯৩৩ সালে ব্রুকলিন জাদুঘরে শিল্পকর্ম চুরি নাটকীয়তার জন্ম দিয়েছে। কে কিভাবে চুরি করেছে তা অজানাই থেকে গেল আজ আবদি।

সবচেয়ে বিস্ময়কর, দিল দি ভ্যানিশিং বোনস বা নিঃশেষিত হাড়, যে গল্পে চীনের পিকিং ম্যানের কাহিনী রয়েছে। পিকিং ম্যান কিভাবে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হল তা কারো জানা নেই।

BanglaBook.org

পাঠক সমাজকে সবেচেয়ে আবেগে-আপ্লুত করেছে মা এবং বাবা হত্যা গল্পটি। এ গল্পে লিজিকে মা এবং বাবার খুনী হিসেবে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হলেও তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুক্তি তর্ক প্রমাণ করা যায়নি। সে নির্দোষ হয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ এমনকি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পর্ষদ সবাই একযোগে খুনীকে চিহ্নিত করতে মাঠে নেমেছিল। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল।

প্রতিটি গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে। রহস্যের সমাধান করতে পারেনি কেউই। একটি বিষয় প্রমাণ হয়েছে, কিছু অলৌকিক ব্যাপার ছিল বটে। বাস্তবে কি সেটাই না কি সর্বোচ্চ মহলের ব্যর্থতা? অন্য কিছু ভাবলে বলতে হয় পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ অর্থকড়ি লেনদেন করে মামলা ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করেছিল। এই অমূল্য বইটি আমাকে অনুবাদ করতে বলেন, মুক্তদেশ প্রকাশন এর তরুণ লেখক ও প্রকাশক জনাব, জাবেদ ইমন। তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমন সুন্দর একটি বই নির্বাচন করার জন্য। যা পড়তে পড়তে পাঠকগণ মুগ্ধ হবেন, শিহরিত হবেন আবার বিস্ময়ও প্রকাশ করবেন। বইটি পড়তে পড়তে পাঠকগণের কপালে দেখা দিবে চিন্তার রেখা ও মনে জাগবে হাজারো প্রশ্ন?

মোস্তফা আরিফ

অনুবাদক

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সূচীপত্র

কুখ্যাত বিমান ডাকাতি ১৩
পঞ্চম এভিনিউতে হত্যা ৩১
বদমেজাজী দশ শিক্ষক ৪৯
বানরের নাকাকৃত মানুষ ৬৪
নিঃশেষিত কঙ্কাল ১০৮
পিকিং ম্যানের পুরাকীর্তি রক্ষা কর ১২১
মা এবং বাবা হত্যা ১৩১

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

কুখ্যাত বিমান ডাকাতি

ফ্লাইট নং ৩০৫। নর্থওয়েস্ট এয়ারলাইন্স। অভ্যন্তরীণ রুটের বিমান। খুব বেশী যাত্রী নেই। নর্থয়েস্ট এয়ারলাইন্স আন্তঃমহাদেশীয় যাত্রাপথে নিয়মিত এবং সঠিক সময়ে চলাচল করে। যাত্রীদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিতে এর জুড়ি মেলা ভার। এবার বিমানটি যাবে পোর্টল্যান্ড থেকে ওয়াশিংটন ডিসির সিয়াটলে। এসময় একজন যাত্রীর জন্যই অপেক্ষা করছে বিমানটি। যাত্রীটি হন্তদন্ত হয়ে বিমানে উঠল। স্টুয়ার্ট ফ্লোরেন্স শাফনার তাকে সাহায্য করল। তার মালপত্র সুন্দরমত গুছিয়ে দিল। তারপর নিজের আসন গ্রহণ করল। বিমানের সর্বশেষ গন্তব্যস্থল সিয়াটল, এর মাঝে পাঁচ স্থানে অবতরন করবে।

বিমানের যাত্রীরা আরাম-আয়েসে বসে আছে। অনেকেই চোখ বন্ধ করে আছে। হাল্কা ঝিমুনি হচ্ছে কারো কারো। কিন্তু একজনের চোখে কোন ঘুম নেই। ভিন্ন চিন্তায় সে বিষণ্ন। বাস্তবিক অর্থে লোমহর্ষক কাহিনীর জন্মদাতা সে। দুর্দান্ত অপকর্মে সে পারঙ্গম। গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছে নর্থওয়েস্ট এয়ারলাইন্স। এ বিমান কিভাবে ছিনতাই হয়ে গেল তা যেন লোমহর্ষক কাহিনী, দারুণ নাটকীয় ঘটনা বটে। বিমানে ৩৬ জন যাত্রী, ৬ জন ক্রু যখনই অপহরণকারী এবং বিমান ছিনতাইয়ের কথা স্মরণ করে তখনি তারা চমকে উঠে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, বিমান ছিনতাইয়ের লোমহর্ষক কাহিনী শুনে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এফবিআই, সেনা এবং বিমান বাহিনী পর্যন্ত হতবাক হয়ে যায় ।

বিমান ছিনতাইয়ের নায়ক ডি.বি. কুপার। এ কাজে তার দক্ষতা জুড়ি মেলা ভার। অপরাধ জগতের ইতিহাসে ডি.বি. কুপার যেন মহান সম্রাট। তার সুচতুর বুদ্ধি, পরিকল্পনা, কৌশল বিশ্বকে হতবাক করে তোলে। অভ্যন্তরীণ বিমান ছিনতাই করার উদ্দেশ্য তার একটাই– এর মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার, ছিনতাইকারী ডি.বি. কুপার কখনোই গ্রেফতার হয়নি এবং সরকারের পুলিশ বাহিনী তাকে হত্যা করতে পারেনি। বিমানের যাত্রী সেজে ঠিক সময়মত পাইলটের রুমে প্রবেশ করে গন্তব্যস্থল পরিবর্তন করে ফেলে। পাইলট বাধ্য হয়েই তার কথামত বিমান চালায়।

২৪ নভেম্বর ১৯৭১। দুধর্ষভাবে বিমান ছিনতাই হল। ডি.বি. কুপারকে চ্যালেঞ্জ করার মত যেন কেউ নেই। সেদিনটি ছিল ধন্যবাদ দিবসের আগের

BanglaBook.org

সন্ধ্যা। অবিশ্বাস্য কাজ করে বসলেন ডি.বি. কুপার। পেশাদারী বলি আর সৌখিন ছিনতাইকারীই বলি ডি.বি. কুপারের কাজ চ্যালেঞ্জ করার মত কেউই নেই।

সন্দেহাতীতভাবেই বলা চলে, বিমান ছিনতাইয়ে ডি.বি. কুপার বিশেষ কিছু দক্ষতা রাখেন। কৌশলে অত্যন্ত পটু। আর তার এ সুচতুর কৌশলই মিশন পূরণে সহায়তা করে। উড়ন্ত বিমান ছিনতাই করার ক্ষেত্রে তার মত অভিজ্ঞ আর কেউ আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে? তবে একটা ব্যাপারে কেউই দ্বিমত পোষন করে না বিমান ছিনতাই করে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া একমাত্র ডি.বি. কুপারের পক্ষেই সম্ভব। বিশেষ করে অপরাধ জগতের উদ্যোক্তা বা গোষ্ঠীর কাছে তার মূল্য অপরিসীম। তার চিন্তা ও পরিকল্পনা বিশেষ বিবেচনা না করে উপায় নেই। একটা বিষয় খুবই প্রাণিধানযোগ্য, বিমান ছিনতাই করে সে যখন পালিয়ে যায় তখন অনেক কিছুই চিহ্ন সরূপ রেখে যায় বটে। এর ফলে তার যাত্রার সাথে যারা সাথী হয়, তারাও পর্যন্ত ভুলতে পারে না তার কথা। প্রত্যেকে তার কাজে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু এত কিছুর পরও গোয়েন্দা, পুলিশ বিভাগ কেউই তার সন্ধান দিতে পারে না।

প্রখর বুদ্ধিমান ডি.বি. কুপার। যখনই কোন বিমান ছিনতাই করে তখন সে ওয়ানওয়ে টিকিট কেনে। এটা তার বড় ধরনের চালাকি। পোর্টল্যান্ড থেকে সিয়াটল যেতে ২৫ মিনিট সময় লাগে। আর এ কারণে টিকিট বিক্রেতা নিশ্চয়ই কোন টিকিট ক্রেতার কথা স্মরণ রাখবে না। কত যাত্রীই তো টিকিট কাটছে। কে, কি ধরনের মানুষ তা নিয়ে গবেষণা, চিন্তাভাবনার সময় কোথায় টিকেট বিক্রেতার? বিমান যেখানে অবতরণ করে আছে সেখানে যাত্রীরা সারিবদ্ধভাবে উঠছে। যাত্রীদের চিন্তা চেতনা একটাই তা হচ্ছে নির্দিষ্ট আসনে বসা। তারপর গন্তব্যে পৌঁছানো। যাত্রীদের নিয়েও বিমান কর্মকর্তাদের তেমন ভাবনা নেই। যাত্রীরা কোন অভিযোগ না করলে তাদের প্রতিও তেমন দৃষ্টি দেয় না কর্তৃপক্ষ। ফলে কোন যাত্রী কি করছে, কি চিন্তা ভাবনা করছে তা নিয়ে ভাবার সময় কোথায়? প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। যাত্রীদের মধ্যে কে বিমান ছিনতাইকারী তা বুঝার সহজ কোন উপায় নেই। যাত্রীরা ঠিকমত আসন গ্রহণ করেছে কিনা এবং সিটবেল্ট বেঁধেছে কিনা তাই শুধু লক্ষ্য করে স্টুয়ার্টরা।

ডি.বি. কুপার শান্ত মনে তার আসনে বসেছিল। তার মধ্যে নেই কোন উত্তেজনা, নেই কোন অস্থিরতা। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট শাফনার এবং তার সতীর্থ টিনা ম্যাকলো একবার পুরো বিমানের যাত্রী আসনে বসা সবাইকে পর্যবেক্ষণ করল। এতেও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ডি.বি. কুপারের। শাফনার এবং টিনা

BanglaBook.org

ম্যাকলো সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানাল। তাতেও কর্ণপাত করেনি কুপার। বাস্তবিক অর্থে সে তার চিন্তা ও পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। অবশ্য একবার আসন ছেড়ে পায়চারি করল। চারিদিকে সবকিছু লক্ষ্য করল।

বিমান উড়তে শুরু করল। সীমাহীন আকাশে উড়ে চলেছে। নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে। এবার শুরু হল ডি.বি. কুপারের আসল খেলা। বিমানে ৪০ জন যাত্রীর সবাইকে বন্দি করে ফেলল। বন্দুক তাক করল। কারো মুখে কোন কথা নেই। যাত্রীরা টানা তিনঘণ্টা ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে সময় কাটালেন। ডি.বি. কুপার পাইলটের রুমে প্রবেশ করে তাকে নির্দেশ দিল। পাইলট অসহায়ের মত তার কথা শুনল।

এদিকে বিমান কে ছিনতাই করেছে পরবর্তীতে চল্লিশজন প্রত্যক্ষদর্শী যাত্রীর কাছে থেকে পুলিশ জানতে চায়। প্রত্যেকেই একটি কথাই বলেছে,

"কালো চশমা এবং বাদামী রঙের স্যুট পরিহিত ছয় ফুট লম্বা এক মাঝবয়সী, সুদর্শন পুরুষ অস্ত্র তাক করে সবাইকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। তারপর পাইলটের রুমে চলে যায়। তার হাতে ছিল একটি বিশাল ব্যাগ। নিজেই সেই ব্যাগ বহন করছিল।"

প্রত্যেকের ধারণা সেই ব্যাগেই অস্ত্র ছিল। কিন্তু এর মাধ্যমে তো আর বিমান ছিনতাইকারীর সুনির্দিষ্ট পরিচয় মেলে না। আর একটা বিষয় পুলিশের নজরে এল। তার হাতের কিছু লেখা রয়েছে। এর মাধ্যমেও অপরাধীকে খুঁজে বের করা সহজ নয়।

ডি.বি. কুপার সব সময় বিমানের পিছনের সারির যেকোন সিটে বসতে পছন্দ করত। যাত্রার সময় সেভাবেই টিকিট কাটত সে। এর পিছনে অন্যতম কারণ, পিছনে বসে সবকিছু সে পর্যবেক্ষণ করা যায়। মূলত সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সে নিজের পরিকল্পনা মতই করে নিত। তার আসনে বিড়ালের মত করে শুয়ে থাকত তার চাল চলন একেবারে ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কের মত। শেষ আসনে যেহেতু সে বসত ফলে পিছনে থাকত বিমানের শেষ পার্টিশন। ফলে তাকে যে পিছন থেকে কেউ দেখবে সে সুযোগ নেই। বরং সামনে বসা সব যাত্রীদের গতিবিধি সে ঠিকই দেখতে পেত। এমনভাবে সবার দিকে তাকাত, যেন মনে হত নির্দেশ দিচ্ছে সবাইকে।

বিমানটি সীমাহীন আকাশে উড়ার এক মিনিট পর বহু যাত্রী ধূমপান করছিল। ডি.বি. কুপার তার মিশন শুরু করল। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট শাফনার পুশ বাটন টিপে সিগনাল দিয়ে রাখল। যাত্রীদের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে হলে সে প্রস্তুত আছে। সব দায়িত্ব তার কাঁধে।

BanglaBook.org

অপরাধ জগতের সম্রাট ডি.বি কুপার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আকর্ষণীয়, সুন্দরী এবং বুদ্ধিমত্তায় অনন্য মিস শাফনার যাত্রীদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করছিল। প্রত্যেকের সাথে হেসে হেসে কথা বলছিল। এয়ার হোস্টেস হিসাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের কল্যাণে মিস শাফনার জানেন কিভাবে মন মেজাজ ঠান্ডা রাখতে হয়। কখনো সে রেগে যায় না। যাত্রীদের প্রতি ক্ষুব্ধও হয় না।

চোখে সানগ্লাস পড়েছে ডি.বি. কুপার। অন্য সবার থেকে সে যে পৃথক সেটাই বুঝাতে চায়। অন্যের উপর নির্ভর করে না। নিজে খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী। শাফনার যখন তার সামনে দিয়ে গেল, তখন সে কিছুই বলল না, শুধুমাত্র একটা কাগজ ভাঁজ করে তার হাতে দিল।

শাফনার কাগজটি হাতে নিয়ে হাঁটা দিল। সে খুবই লজ্জা পেল। তার ধারণা যাত্রীটি হয়ত এ কাগজে ভালবাসার চিরকুট দিয়েছে।

শাফনার বলল,

" ভেবেছিলাম সে আমাকে হয়ত লজ্জা দেয়ার জন্যই কিছু লিখেছে।"

একটা বিষয়ে বিমান বালারা সবাই একমত তা হচ্ছে, যাত্রীরা সব সময় সঠিক। তারা মনের কথা বলতেই পারে। আর এ কারণেই শাফনার তার দেয়া চিঠি ডি.বি. কুপারের সামনে পড়ল না। সেটা ভদ্রতার লক্ষণও নয়। বরং মিষ্টি হাসি দিয়ে ভাঁজ করে নিয়ে গেল। বুঝাতে চাইল, তোমার দেয়া এ প্রেমপত্র পড়ে তবেই বিবেচনা করে দেখব। শাফনার ভাবছিল চিরকুট যিনি লিখেছেন তিনি নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন কখন তার চিঠি পড়বে বিমান বালা। এতেও এক ধরনের আনন্দ বৈকি। চিঠি প্রেরণকারীকে চিন্তার মধ্যে রাখা আর কি।

চিঠিটা শাফনার পকেটে রাখল। এদিকে ডি.বি. কুপার অস্থির হয়ে উঠল। তার একটাই চিন্তা শাফনার যেন চিঠিটা তাড়াতাড়ি পড়ে। যাহোক শাফনার পিছনের সারিতে গিয়ে চিঠিটা পড়তে থাকে। এসময় এক যাত্রী আর সিমন্স তার সামনেই ছিল।

চিঠিটা পড়তে গিয়েই হতভম্ব হল শাফনার। তার চোখ ছানাবড়া, ভয় হল। কিন্তু ডি.বি. কুপার নিজের ইচ্ছা পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চিঠিটা খুবই স্বল্প ভাষায় লেখা। শাফনারও এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল। বিষয়বস্তু বুঝতে যেটুকু সময় লাগল সে পর্যন্ত বারবার চিঠিটা পড়ল।

ডি.বি. কুপার দাবী করেছে ১০ হাজার ডলার এবং দুটো প্যারাস্যুট। এর ব্যতিক্রম হলে ফ্লাইট ৩০৫ যাত্রী ও ক্রুদের বিমান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে।

শাফনার নিজেকে প্রশ্ন করল, এটাও কি সত্যি সম্ভব? শাফনারের মনের কথা যেন বুঝতে পারল কুপার। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ব্রিফকেস খুলল। ব্রিফকেস থেকে সিলিন্ডার গ্যাস কয়েল বের করল। ভীত শাফনার

BanglaBook.org

নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করল। তার মনের অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া বুঝার চেষ্টা করছিল কুপার। এদিকে যাত্রীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হল। মহাশূন্যে বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা চলছে। এদিকে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেট এফবিআই ঘটনা জানতে পেরে বিমানের টায়ারে গুলি করার লক্ষ্য স্থির করল। তারা গুলি করল বটে কিন্তু তা ছিনতাইকৃত বিমানের টায়ারে না লেগে যাত্রীর গায়ে বিদ্ধ হল। তিনজন যাত্রী তৎক্ষণাত মারা গেল। ভয়ংকর পরিবেশে আটকে আছে সবাই।

শাফনার সহ কেউই যেন শংকামুক্ত হতে পারছে না। তাদের ভয় করছে। একদিকে যাত্রীদের মধ্যে ভয়, এই বুঝি তারা কুপারের রেখে দেয়া গ্যাস সিলিন্ডার বোমা বিস্ফোরণে মারা যাচ্ছে আর অন্যদিকে এফবিআই অপরাধীকে ধরতে গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু গুলিতে মারা যাচ্ছে যাত্রীরা। কোনপক্ষই যেন ৪২ জন যাত্রীকে বাঁচাতে কোন ধরনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। কুপারকে যাত্রী হিসাবে চিহ্নিত করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩ জন। বিমান ধ্বংস করতে চাচ্ছে না এফবিআই। তিন ইঞ্জিন বিশিষ্ট ৭২৭ বোয়িং বিমানের মূল্য কয়েক লক্ষ ডলার।

গ্যাস সিলিন্ডার ধরিয়ে দিয়েছে কুপার। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। এরকম ভয়ার্ত অবস্থায় শাফনার ককপিটের দিকে এগুলো। পাইলটের কাছে গেল। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম স্কটের হাতে ডি.বি. কুপারের লেখা চিরকুট ধরিয়ে দিল। স্কট আর দেরি না করে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সিয়াটল কন্ট্রোল রুমে দ্রুত এ তথ্য জানাল। কন্ট্রোল রুমের কাছে পরবর্তী নির্দেশনামা জানতে চাইল। কন্ট্রোল রুম থেকে পাল্টা জানান হল, বিমান ৭২৭ যেন পুলিশ ও এফ.বি.আই-এর সাথে যোগাযোগ করে। নর্থওয়েস্টের প্রশাসক ডন নিরোপের সাথে কথা বলে তাদের পরামর্শানুযায়ী কাজ করতে নির্দেশ দেয়া হল। উইলিয়াম স্কট ফোন করলেন নিরোপকে।

তিনিও তাকে বললেন,

"ডি.বি. কুপার যে দাবী করেছে, যা চাচ্ছে, তাই পূরণ করা।"

এদিকে ক্যাপ্টেন স্কটকে কন্ট্রোল রুম থেকে বলা হল,

"এফবিআই এবং পুলিশ পরামর্শ দিয়েছে ডি.বি. কুপারের বিরুদ্ধে যেন কোন ব্যবস্থা না নেয়া হয়।"

তারা আরও বলল,

"কোন অ্যাকশন নেয়া যাবে না।"

বাস্তবিক অর্থে ক্যাপ্টেন স্কট এবং বিমানের অন্য ক্রুরা কি অ্যাকশন নেবে বা নিতে পারে তা কেউই জানেনা। তা সত্ত্বেও কেউ যদি অত্যন্ত সাহসী হয়

BanglaBook.org

অথবা সিনেমার নায়ক বা নায়িকা ভেবে ডি.বি. কুপারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যায় তাহলেই বিপদ। এজন্য বিমান কর্তৃপক্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সবাইকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিল।

যাত্রীরা শংকিত। বিমানের এখনও বড় ধরনের কোন ক্ষতি হয়নি, তারা অনুধাবন করল। বিমান তার গন্তব্যস্থল সিয়াটলে যাচ্ছে। তবে বিমান কেন অবতরণ করতে পারছে না সে ব্যাপারে তারা অসচেতন ছিল।

এমনকি ক্যাপ্টেন স্কট তার রুম থেকেই মাইকে বলছিল,

"বিমান অবতরণে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। যান্ত্রিক ও কারিগরি সমস্যা হয়েছে।"

তার একথাও যেন কারো কানে গেল না। যাত্রীরা তার এ জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা কথা মেনে নিল। এদের মধ্যে একজনই পুরো ব্যাপারটা জানতেন। বিমান ছিনতাই হয়েছে এবং ছিনতাইকারী ডি.বি. কুপার সেটা পাইলট জানতে পেরেছেন। ডি.বি. কুপারের সাথে বিমান কর্তৃপক্ষের আলোচনা চলছিল এবং তারা সমঝোতার চেষ্টা করছিল। ডি.বি. কুপার কোন কথাই বলছিল না। তার দাবীতে সে অটল।

বোয়িং ৭২৭ একের পর এক রাউন্ড দিচ্ছে। অবতরণের চেষ্টা করছে কিন্তু বিমান বন্দরের সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারছে না বিধায় অবতরণ করা সম্ভব ছিল না। এদিকে ডি.বি. কুপারের দাবী অনুযায়ী নর্থওয়েস্টের কর্মচারীরা সিয়াটলে ব্যাংক খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা ১০ হাজার ডলার সংগ্রহের চেষ্টা করছে। নর্থওয়েস্টের অন্য কর্মচারীরা দু'টি প্যারাসুট কোথায় পাওয়া যায় তার খোঁজ করছিল। প্যারাসুটও দাবী করেছে ডি.বি কুপার। সব কিছু যোগাড় করতে সময় লাগছিল। আর এ কারণেই ডি.বি. কুপার তার দাবী না মেটানো পর্যন্ত বিমান অবতরণ করার সুযোগ দিচ্ছিল না।

টিক টিক করে সময় পার হচ্ছে। সেকেন্ড থেকে মিনিট, মিনিট থেকে ঘণ্টা, চারিদিকে অস্থিরতা, যাত্রীদের মধ্যে পাহাড় সমান উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অস্বাভাবিক চিন্তা বাড়ছিল। ভয়ও হচ্ছিল তাদের। তারা এটা বুঝতে পেরেছে, বিমানে ভয়াবহ কোন সমস্যা হয়েছে এবং বিপর্যয় অতি সন্নিকটে।

সব কিছুর পরও ব্যতিক্রম হচ্ছে ডি.বি. কুপার। নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে সে। তার মধ্যে কোন ভয় ভীতি কাজ করছে না। বিমান ছিনতাইয়ের নায়ক সে। এক যাত্রীর পাশে বসেছিল সে।

পুলিশ তদন্তকালে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল এবং সে বলেছিল,

"ডি.বি. কুপার একদম নিশ্চিন্ত মনে বসেছিল।"

BanglaBook.org

নর্থওয়েস্ট থেকে যখন জানান হল, ছিনতাইকারী ডি.বি. কুপারের দাবি অংশত মেটানো সম্ভব ঠিক তখনই সে বেঁকে বসল। তারা তার দাবিকৃত ১০ হাজার ডলার এবং বিমান বাহিনী কর্তৃক দু'টো প্যারাসুট দিতে চাচ্ছে ঠিক তখনই ডি.বি. কুপার তা নিতে অস্বীকার করল।

সে পুণরায় বলল,

"দাবী মেটাতেই হবে।"

ক্রীড়াক্ষেত্রে যেসব প্যারাসুট ব্যবহার হয় তাকে সেটাই দিতে হবে। আকাশে যেসব প্যারাসুট দিয়ে ডাইভিং করা যায় সেগুলো চাই-ই তার এবং সে সব প্যারাসুট দিয়ে মূল লক্ষ্যভূমিতে অবতরণ করা সহজ।

মাকনোর সাথে যোগাযোগ করল কুপার। তার কথা ক্যাপ্টেন স্কটকে জানাতে বললেন। মাকনো তা দ্রুত জানিয়ে দিল স্কটকে। তারপর যত দ্রুত সম্ভব স্পোর্টিং প্যারাসুট যোগাড়ের চেষ্টা করা হল।

টাওয়ারকে স্কট বলেন,

"যত দ্রুত সম্ভব ক্রীড়া প্যারাসুট এনে দিন।"

টাওয়ার জানালেন,

"আমরা চেষ্টা করছি। যুবককে একটু ধৈর্য্য ধরতে বলুন।"

স্কট বললেন,

"সে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। যত দ্রুত স্পোর্টিং প্যারাসুট পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।"

এ সময়ের মধ্যে সিয়াটল থেকে সব ব্যবস্থা করা হল। বহনকারী মালপত্র নিয়ে অন্য একটি এয়ারক্রাফট বিমান বন্দর থেকে বেশ দূরে রওনা হল। পোর্টল্যান্ড থেকে সিয়াটলে পৌঁছতে যেখানে ২৫ মিনিট সময় লাগে সেখানে শ্বাসরুদ্ধকর তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

দীর্ঘ সময় পর বিমান অবতরণ করল। যাত্রীরা উপলব্ধি করল এবং নিজেদের মত করে আবিষ্কার করল যান্ত্রিক ত্রুটি নয় বরং বিমান ছিনতাই হয়েছিল। তারা যতটা না বিরক্তিকর তার থেকেও বেশি বাজে অবস্থার মধ্যে ছিল। বিমানটি যখন অবতরণ করল বিমানবালা এবং ছিনতাইকারী উভয় পক্ষই বিপদের আশংকা করছিল।

বিমান বালা এবং যাত্রীরা ভাবছিল ছিনতাইকারীর পক্ষের সন্ত্রাসীরা হয়ত গোলাগুলি শুরু করে দেবে। আর ছিনতাইকারীর চিন্তা হচ্ছিল পুলিশ তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে হত্যা করবে। কি ঘটতে পারে সে ব্যাপারে কোন

BanglaBook.org

পক্ষই নিশ্চিত ছিল না। ফ্লাইট ৩০৫ এর যাত্রী, বিমানবালা এবং ছিনতাইকারী বাস্তবিক অর্থেই কোন কঠিন আইনের বেড়াজালে পড়তে যাচ্ছে কিনা তা বোঝার উপায় ছিল না। আর একটি ভাবনা ছিল অনেকেরই। এটা অবশ্য যাত্রীদের একান্ত নিজস্ব চিন্তা। যদি চারিদিক থেকে গোলাগুলি হতে থাকে তাহলে তারা বিমানের মধ্যেই বসে থাকবে। তাদের জন্য কি ধরনের অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে কেউই নিশ্চিত করে কিছুই জানেনা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ফ্লাইট ৩০৫-এর যাত্রীদের কিভাবে বিমান থেকে নামিয়ে চেক করবে সেটা নিয়েও কম উৎকণ্ঠা ছিল না। উভয়পক্ষই একে অপরকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছিল। ডি.বি. কুপারের নিজস্ব কোন বুদ্ধি পরামর্শ ছিল কি?

বিমানের অবতরণ স্থানে কি পুলিশ এবং অন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী ঘিরে রয়েছে? তারা কি ছিনতাইকারীকে দেখামাত্র গুলি চালাবে? কেউই এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছুই জানেনা। সবকিছু কুয়াশাচ্ছন্ন ব্যাপার বটে।

এরকম অবস্থায় প্রথম যে ঘটনাটি ঘটে, তা হচ্ছে বিমান ছিনতাইকারী নিজেই যাত্রীদের হাতে বোমা তুলে দেয়। যাতে করে যাত্রীরা পুলিশ বাহিনীর প্রতি বোমা বর্ষণ করতে পারে। আর সে সুযোগে সে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে পারে। অবশ্য এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটায়নি ডি.বি. কুপার। সে কোন যাত্রীর হাতে বোমা তুলে দেয়নি। যাত্রীরা আশা করেছিল, কেউই অযাচিত হস্তক্ষেপ করে বিপদ ডেকে আনবে না। ফলে যাত্রীরা একে একে বিমান থেকে নামল। সৌভাগ্যই বলতে হয় যাত্রীদের। সবকিছু সুন্দর মত পরিচালিত হল। ডি.বি. কুপার কোন বোমা ফাঁটায়নি। পুলিশের দিক থেকে গুলিবর্ষণও হয়নি। খুব দ্রুত ও সুন্দর মত কাজ সমাধা হল।

বিমান অবতরনের পর সবার আগে রাজ্য সরকারের বিমান ও পর্যটন প্রশাসনের কর্মকর্তা এগিয়ে এল।

তিনি কুপারকে বলতে চাচ্ছিলেন,

"তার পথ ছিল সম্পূর্ণ ভুল।"

কুপার তার উত্তরে বলল,

"ভুল শুদ্ধের বিচার করার ইচ্ছা নেই। আমার প্রাপ্তিটুকু পেলেই হল। আমাকে সঠিক পথটা দেখান, সে পথেই চলে যাব।"

BanglaBook.org

উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। ফেডারেল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ তার দাবী মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। তার দাবীকৃত ১০ হাজার ডলার এবং স্পোর্টস প্যারাস্যুট দেয়া হল। এতেই সন্তুষ্ট ডি.বি. কুপার। এরপর নিজের কাজে মন দিল। তার অন্য পরিকল্পনা বাতিল করল। প্যারাসুট নিয়ে বিমান থেকে উড়ে যাওয়ার আগে

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট মাকলো এবং ককপিটের ক্রুর সাথে শেষবারের মত কথা বলল।

এদিকে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ডি.বি. কুপারের কাছ থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকল। এয়ার হোস্টেজরা বিমানের সব ইঞ্জিন এবং দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। তারা নিচে নেমে আসল। এরপর সিভিল এভিয়েশনের দেয়া ধন্যবাদ দিবসের উৎসবে নৈশভোজে যোগ দিল। বিমানের দরজা বন্ধ। এদিকে জেট বিমান বিশাল শব্দে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। ফ্লাইট ৩০৫-এ দীর্ঘ সময় ধরে অপহরণের যে নাটক চলছিল তা শেষ হল।

পুলিশ এবং বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের কাজ তখনও শেষ হয়নি। বরং তারা নতুন করে ডি.বি. কুপারের লেখা চিঠি নিয়ে গবেষণা শুরু করল। এর কোন গুরুত্ব না থাকলেও সরকারী কাজ বলে কথা, তবে বিমান কর্তৃপক্ষের কোন ইচ্ছা ছিল না ডি.বি. কুপার যা কিছু ফেলে গেছে তা অনুসন্ধান করা। অতীতে তিনটি বিমান বাহিনীর জেট বিমান ডি.বি. কুপারের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রতিবেদন দিয়েছে। সিয়াটল থেকে এয়ার ট্র্যাকারস প্রথম প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, ফ্লাইট দক্ষিণ অভিমুখে রওনা হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ অরগান উপত্যকার দিকে ধাবিত হয়েছে। এমনকি এটা ল্যাটিন আমেরিকা অথবা মেক্সিকোতে যেতে পারে। এর এক মিনিট পর জানা গেল, ফ্লাইট ৩০৫ এর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। এটা এখন পশ্চিমমুখী হয়েছে।

সিয়াটলে বিমান পৌঁছান মাত্র মুক্ত বিমান বালা এবং যাত্রীরা শংকা থেকে রক্ষা পেলেও তখনও স্বস্তি পাচ্ছিল না। এমনকি তারা তাদের তুরস্কের সহযাত্রীদের সাথে মন খুলে কথা বলছিল না, বরং তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে ভয় পাচ্ছিল। ইতস্তত বোধ করছিল। তারা এটা বুঝতে পারছিল, যেভাবেই হোক কুপারের সাথে পুলিশ কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করতে পারে। ফলে তদন্তকারী কর্মকর্তা যখন প্রশ্ন করছিল, তখন বিমান বালা, পাইলট, ক্রু সবাই বুঝে শুনে উত্তর দিচ্ছিল। তাদের কথায় পুলিশ কোন ক্লু খুঁজে পাচ্ছিল না। তাদেরকে নানা রকম তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছিল যাতে করে ডি.বি. কুপার সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে। এমনকি টেলিভিশনের প্রতিবেদকরা বিমান অপহরণকারীর অতীত ইতিহাস তুলে ধরছিল।

তাদের প্রশ্ন ছিল,

BanglaBook.org

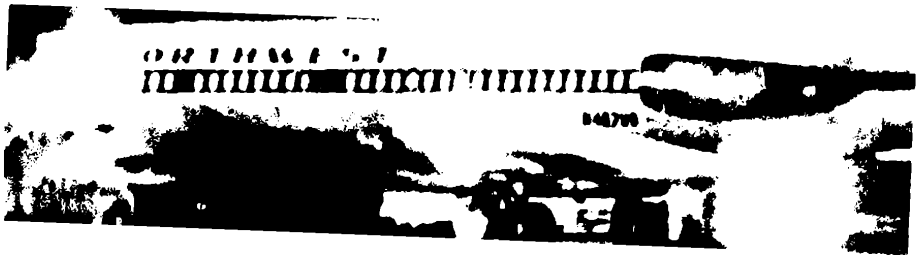

"যখন বিমান ছিনতাই হল সে সময় আপনাদের অনুভূতি কেমন ছিল? আপনারা কি কোন অ্যাকশন নিতে গিয়েছিলেন? কর্তৃপক্ষকে কেমন করে জানালেন?"

এরকম হাজার গণ্ডা প্রশ্ন।

সিয়াটল কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে না হলেও, মনে মনে এটা স্বীকার করল, ডি.বি. কুপারের বুদ্ধি অসাধারণ। সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বিমান যখন মহাশূন্যে ছিল, সে সময়ই কোন একস্থান থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে পালিয়ে গেছে সে। একেবারেই অবাস্তব ঘটনা নয়। আর এটাও সত্য ফ্লাইট ৩০৫ বিমান অবতরণের এক মাইল আগে থেকেই দৌড়াতে থাকে। এই সময়েই ডি.বি. কুপার পালিয়ে গেছে। পাইলটরা জানত বিমান চালনার জন্য কি পরিমাণ গ্যাস মজুদ রয়েছে। আর এ কারণেই বিমানের জ্বালানি কখন শেষ হয় এবং সেভাবেই বিমান বন্দরে অবতরণ করে। জ্বালানি সেভাবেই সংগ্রহ করতে হয়। সেটা নখদর্পনে থাকে পাইলটদের।

প্যারাস্যুট নিয়ে শূন্যে ভেসে বেড়িয়ে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে অনেক সময় সমস্যা হয়। বিশেষ করে আবহাওয়া যদি প্রতিকূল থাকে, তুষারপাত হয় তাহলে প্যারাসুট নিয়ে ঠিকমত অবতরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এত কিছু সত্ত্বেও বিমান কর্তৃপক্ষ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ভুল পথে পরিচালনার চেষ্টা করল।

তারা চিন্তা করে বলল,

"ফ্লাইট যে গন্তব্যে ছিল সে পথেই প্যারাসুট নিয়ে চলে গেছে ছিনতাইকারী। সম্ভবত সেটাই ছিল তার গেমপ্ল্যান। সে কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার পরিকল্পনা থেকে ছিটকে পড়েছিল।"

রাতের আকাশে পথ কি পরিষ্কারভাবে পথ চিনতে পারছিল না। দক্ষিণ এবং পশ্চিমের বন্য পাহাড়ে তুষারপাত হওয়ার কারণেই কি এবং আকাশ থেকে যেসব বরফের টুকরো ভূমিতে পড়ছিল সে কারণেই কি ডি.বি. কুপার তার পরিকল্পনায় ভুল করল। নাকি সে বিমান ছিনতাই পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটাল। সে যখন বিমান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তার দাবীকৃত অংশ পেয়েই গেল তখনই কি তার মধ্যে নতুন করে হতাশার জন্ম নিল? সে কি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল? এর জন্য কি কোন প্রমাণ রেখে যাওয়ার চিন্তার করেছিল সে? অবশ্য সুস্থ মস্তিষ্কে যখন সে এসব ভেবেছে তখন এটা উপলব্ধি করল, নাটকের এখানেই ইতিটানা প্রয়োজন।

তার নিজের মনেই প্রশ্ন জাগল,

"দু'টো প্যারাস্যুটের প্রয়োজন কি?"

BanglaBook.org

নিছক এটা বোকামি। আদৌ এর কোন প্রয়োজন ছিল না।

এতকিছু চিন্তাভাবনা করে আবার সে ফ্লাইট ৩০৫ জেট বিমানে ফিরে এল। তারপর ডি.বি. কুপার নিজেই পুলিশের দেয়া প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। তার উত্তরগুলো লিখছিল টিনা ম্যাকলো আর সাথে সাথে পাঠানো হচ্ছিল ক্যাপ্টেন স্কটকে। তারা স্কটকে নির্দেশ দিল এসব তথ্য যেন মেক্সিকোতে জানান হয়।

টিনা ম্যাকলো ককপিট কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে সবাইকে জানাল,

"বিমান জ্বালানি সংকটে পড়েছে আর সেজন্য মেক্সিকোতে অবতরণ করতে হবে।"

ডি.বি. কুপার কোন প্রতিবাদ ছাড়াই এ প্রস্তাব মেনে নিল। আর একটা নির্দেশনা দেয়া হল স্কটকে।

ম্যাকলো জানাল,

"ফ্লাইটের কিছু পরিবর্তন হয়েছে।"

স্কট বললেন,

"বিমান দক্ষিণ অভিমুখে পোর্টল্যান্ডের দিকে এবং তারপর পশ্চিম দিকে রেনো বিমান বন্দরে অবতরণ করবে।"

সেখান থেকেই জ্বালানি সংগ্রহ করবে। রেনো বিমান বন্দর সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১০ হাজার ফুট নিচে। জেট বিমান ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে চলছিল।

ডি. বি. কুপার এসময় দুষ্টমি বুদ্ধি আঁটল। টিনা ম্যাকলোকে পাজাকোলা করে যাত্রীশুন্য বিমানে নিয়ে ককপিটে গিয়ে তাকে আটকে রাখল।

তাকে নির্দেশ দিল,

"সব নির্দেশ যেন সংরক্ষণ করে রাখে।"

আর এ সময়ই শেষবারের মত হয়তো ডি.বি. কুপারকে কেউ দেখেছে।

যেভাবেই বলি না কেন, যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখি না কেন, বিমান ছিনতাইকারী হিসাবে কুপারের অসীম ক্ষমতার যে তুলনা নেই তা বলাই বাহুল্য।

বিমান যখন অবতরণ করল তখন রেডলাইট জ্বলে উঠল। এটা হচ্ছে বিমান অবতরণের সিগন্যাল। তখন সন্ধ্যা ৭টা ৫০। দ্বিতীয়বার রেডলাইট জ্বলল ঠিক রাত ৮টা ১০-এ। এটা মূলত ফ্লাইট ৩০৫ অবতরণের মূল নকশা ছিল না। স্কট কঠিন পরিস্থিতির শিকার হল। সে তার একমাত্র যাত্রী ডি.বি. কুপারকে শুধু ভালো কিছু জানানোর চেষ্টা করল।

স্কট বললেন,

"আপনার জন্য আমরা যেকোন কিছু করতে পারি।"

কোন উত্তর দিল না ডি.বি. কুপার। রাত তখন ৮টা ১০-এ। বিমান কাসকেড পর্বতমালার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। এটা হচ্ছে ওয়াশিংটনের

BanglaBook.org

দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকা। এখানেই মারভিন হ্রদ, পাশেই লুইস নদী। নদীর পাশ দিয়ে ওয়াশিংটনের দক্ষিণাঞ্চলের ব্যস্ততম নগরী। এলাকাটি রাত ১০টার পর নিরব নিথর হয়ে যায়। তখন এ নগরীকে দেখলে মনে হবে, প্রাচীন কোন বনভূমিতে চলে এসেছি। যেন সভ্যতা এখনও পৌঁছেনি। লুইস নদীর পাশ দিয়ে ওয়াশিংটনের উডল্যান্ড নগরী। পোর্টল্যান্ড এবং উডল্যান্ড মহানগরী এতটাই কাছাকাছি যে বিমানে কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র। পোর্টল্যান্ড থেকেই ডি.বি. কুপার ঐদিন সন্ধ্যায় বিমানের ওয়ান ওয়ে টিকিট কেটেছিল।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, পুলিশ এবং বিমান বাহিনী একটা বিষয় ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছিল না, ডি.বি. কুপার যদি রাত ৮টা ১০-এ উডল্যান্ড থেকে বিমানে প্যারাস্যুট দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে যে শুধু নর্থওয়েস্ট এয়ার লাইন্সের সাথে আঘাত লেগে ইনজুরির শিকারই হবে না সে সাথে ২ লাখ ডলার মিস করবে। রাউন্ড ট্রিপের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হবে সেটাও মিস করবে। নিশ্চয়ই এতটা বোকা নয় ডি.বি. কুপার। এসব চিন্তা ভাবনাই করছিল পুলিশ। কয়েক ঘণ্টা পর রেনো বিমানবন্দরে অবতরণ করল ফ্লাইট ৩০৫। অবতরণ না করা পর্যন্ত ক্রুরা ককপিট থেকে বের হল না। একমাত্র সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে গেল ডি.বি. কুপার, সে একটা প্যারাস্যুট নিয়ে পালিয়ে গেল। কুপার আরেকটি প্রমাণ রেখে গেল, সে সাথে সানগ্লাস, বাদামী রঙের কোট, ব্রিফকেস, দুটি লাল রঙের সিলিন্ডার রেখে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সন্ধ্যা ৭টা আগেই বিমানের গোপন দরজা দিয়ে প্যারাস্যুট নিয়ে বেরিয়ে গেল। বিমানটি তখন ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে চলছিল।

উডল্যান্ডের মানুষ তাদের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের জন্য গর্ববোধ করে। এখানে রয়েছে দেশের স্বনামধন্য পত্র-পত্রিকার প্রধান কার্যালয় এবং টিভি সেন্টার। রাষ্ট্রের প্রধান চারটি অঙ্গই এ উডল্যান্ডে। সুসংগঠিত সামরিক বাহিনী। ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের বাসভবন ছাড়াও বেসরকারী পর্যায়ে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান এ নগরীতে।

শীতকালে প্রচণ্ড তুষারপাত এ নগরীর ২৫০ বর্গমাইল এলাকায় বরফে ঢেকে যায়। তখন খুবই সমস্যা হয়। পুরো নগরী যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিমান চলতে সমস্যা হয়। এমতাবস্থায় টানা দু'চারদিন কোন বিমান আকাশে উড়তে পারে না। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা জনসাধারণ ও প্রশাসনের সাথে মিলেমিশে কাজ করে রাস্তা থেকে বরফ সরাতে থাকে। এরকম অবস্থায় কেউ প্যারাসুট নিয়ে কোন স্থান পাড়ি দেবে বা পালিয়ে যাবে তা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু ডি.বি. কুপার তাই করেছিল।

তাহলে প্রশ্ন জাগে,

"সে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল।"

BanglaBook.org

ওয়াশিংটনের উডল্যান্ড থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে উড্ডয়ন করছেন এক পাইলট।
তিনি ডি.বি কুপারকে অনুসন্ধান করছেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিমান ও প্রতিরক্ষা বাহিনী, সিভিল এ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের চেষ্টাই ব্যর্থ হল। তারা কোন কিছুই উদ্ধার করতে পারল না।

অনেকেই বলতে থাকে,

"এ খোঁজাখুঁজি অযথা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থের অপচয় হয়েছে মাত্র।"

টানা এক সপ্তাহ অনুসন্ধানের পর কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দিল। তারা আবহাওয়ার বিপর্যয়ের কথা বলে অনুসন্ধান বাতিল করল।

উডল্যান্ডের কাউন্টি উপমেয়র ম্যাকডয়েল বলেন,

"আমাদের পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত হবে যখন এ তুষারপাত শেষ হবে তখনই প্যারাস্যুট কোথায় পড়েছিল এবং সেখানে কোন মানুষ আছে কি না তা খুঁজে বের করা।"

এক পর্যায়ে, তুষারপাত থেমে গেলেও শৈত্যপ্রবাহ একেবারে কমে যায়নি। ফলে সূর্যের কিরণ ঠিকমত প্রজ্জ্বলিত হতে আরও কিছুদিন সময় লাগে। দুর্ভাগ্য, বরফ সরে যাওয়ার পর উডল্যান্ড গ্রাউন্ডে কোন প্যারাসুট বা মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এমনকি ডি.বি. কুপারের কোন মালপত্র, নগদ টাকা পয়সা খুঁজে পায়নি কেউই। কোন মানুষের চোখে ডি.বি. কুপার ধরা পড়েনি। ঐ তুষারপাতেই মৃত্যুবরণ করেছে ডি.বি. কুপার।

তার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে পোর্টল্যান্ডের এফ.বি.আই প্রধান কর্মকর্তা জুলিয়াস ম্যাটসন বলেন,

"এটা সত্যি হতাশ এবং দুঃখজনক ব্যাপার ডি.বি. কুপারের লাশের সন্ধান আমরা পেলাম না।"

তার এ বক্তব্যের সতীর্থরাও একমত পোষণ করেছিল। জুলিয়াস ম্যাটসন আরও বলেন,

"১৯৭১ সালের ২৪ নভেম্বর ডি.বি. কুপার সম্পর্কে যতটুকু জানা গিয়েছিল এর বেশি আর জানা সম্ভব হয়নি। এ আমাদেরই ব্যর্থতা।"

বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনার ফাইল কৌশলগত দিক থেকে পুণরায় তদন্ত করা হল। কিছু তথ্য যদি পাওয়া যায় এ আশায় তা করা হল। এটা ছিল ডি.বি. কুপারের সুসংগঠিত এবং সুনির্দিষ্ট অপরাধ। কিন্তু সমাধানহীন। বাস্তবে ঐ অপরাধের কোন সমাধান না হওয়ায় সেখানেই এর পরিসমাপ্তি ঘটে। পুরো ঘটনাই রহস্যে থেকে যায়। গোয়েন্দাদের ধারণা, সম্ভবত পরবর্তী কোন এক সময়ে ডি.বি. কুপার আরো বড় ধরনের অপরাধ করতে গিয়েই মৃত্যুবরণ করেন।

BanglaBook.org

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন (বা থেকে ডানে) পাইলট উইলিয়াম স্কট, ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টস টিনা ম্যাকনো এবং ফ্লোরেনা শাফনার

আনসলভ্ড ক্রাইমস্ # ২৯

পুলিশের কাজেও গাফিলতি ছিল। ডি.বি. কুপারকে চিহ্নিত করতে অনেক সময় ব্যয় করেছে কিন্তু বহু কাজই তারা এড়িয়ে গেছে। তাকে চিহ্নিত করতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কাজে লাগানো হয়নি। এমনকি বিমান ছিনতাইয়ের সময় যে চিঠি সে লিখেছিল তাও তদন্ত করা হয়নি। কিন্তু পুলিশ বিভাগ এবং তদন্ত কর্মকর্তা এসব বিষয় এড়িয়ে যেতে পারে না। তারা অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য নিয়ে ডি.বি. কুপারের হাতের লেখা চিঠি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেনি। এর পিছনে আর একটি কারণ হতে পারে, ছিনতাইকারী নিজ হাতে এ চিঠি লেখেনি। এরকম বহু যুক্তি তর্ক দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু সঠিক সমাধানে পৌছতে ব্যর্থ হয় সবাই। গোয়েন্দাগিরি আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পুরো তদন্ত হিমাগারে চলে যায়। কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, বিমান থেকে প্যারাসুট দিয়ে নামার সময় প্রচণ্ড তুষারপাতে মাটিতে অবতরনের আগেই ডি.বি. কুপার বরফে মৃত্যুবরণ করে।

অনেকেই বলছেন,

"তার মৃতদেহ না পাওয়ার কারণ- পুরো শরীর বরফ হয়ে যাওয়ায় টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল এবং বাতাসে ভেসে গেছে।"

আবার কারও কারও মতে,

"সে যে ফাঁদ তৈরি করেছিল সে ফাঁদেই মারা গেছে।"

এটা সম্ভাব্য একটা কারণ হতে পারে বটে।

কিন্তু, শুধু, যদি, অনুমানের ভিত্তিতে এসব চলতে থাকে তাহলে কোনকালেই এ রহস্য উন্মোচিত হবে না। এ কথা সবার জানা ডি.বি. কুপার প্যারাস্যুট দিয়ে মহাশূন্যে দক্ষ চালকের মত গন্তব্যে পৌছাতেও পারে। সে ঈগলের মত ছুটে বেড়ায়। এমনকি যখন সে প্যারাস্যুট নিয়ে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল তখন তার ডান হাতে ২ লাখ ডলারের ব্রিফকেস ছিল। তাহলে তার পরিণতি কি হল? সে রহস্য আজো রহস্যই থেকে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঞ্চম এভিনিউতে হত্যা

দুর্দান্ত এক রহস্যময় ঘটনা। পুরো বিষয়টি অস্বাভাবিক। কেমন করে ঘটল তা কারো জানা নেই। এক প্লেবয়ের মৃত্যু ঘটল নিজ বাসভবনে। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হত্যাকাণ্ড। কিন্তু কে বা কারা করেছে, কেন করেছে সেটাই রহস্যময়। তাকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তার পরনে ছিল কালো রঙের রেশমি পাজামা এবং হালকা গেঞ্জি। এই হত্যাকাণ্ডের পর পত্র-পত্রিকা প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এরকম হত্যাকাণ্ড যেন স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু সত্যিই এটা কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

লোমহর্ষক এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জানতে পেরে নিউইয়র্ক পুলিশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। পুলিশ এ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে বেশ বিচলিত হয়। তারা কূল-কিনারা করতে পারছিল না। ঐ হত্যাকাণ্ডের দু'দশক পরেও রহস্যের জট খোলেনি। এর অবশ্য কারণ একটাই– তদন্তকারী কর্মকর্তা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেনি।

হত্যাকাণ্ডের শিকার হল সার্জ রবিনস্টোন। তদন্তকারীদের সমস্যা ছিল একটাই, কে এ কাজ করতে পারে সে পথে না গিয়ে তারা আগেই তদন্ত করতে থাকে কেন সার্জ রবিনস্টোন খুন হলেন? এতে করেই জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে অনন্তকালের জন্য পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হল।

হত্যাকাণ্ডটি ছিল সত্যিই লোমহর্ষক। নিজ বাসভবনে বেডরুমের মেঝেতে সার্জ রবিনস্টোনকে হত্যা করা হয়েছিল। দেখতে শুনতে তিনি ছিলেন খুবই সুদর্শন। লম্বায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। ৪৬ বছর বয়স। মাঝ বয়সী সুদর্শন এ মহৎ পুরুষ সমাজ সেবার সাথে জড়িত ছিলেন। তাকে নিয়ে পত্র-পত্রিকা বহু প্রতিবেদন ছেপেছে। সবাই তার প্রশংসা করত।

সার্জ রবিনস্টোনের হত্যার খবর সর্বপ্রথম পুলিশকে জানিয়েছিল তারই প্রতিবেশি উইলিয়াম ওর্থি।

তিনি ৬৭ পার্সিনেটে থানা পুলিশ বাহিনীকে ফোনে জানান,

"পঞ্চম এভিনিউয়ের ৮১৪ নম্বর ফ্ল্যাটে এক ব্যক্তি খুন হয়েছে।"

সেটা ছিল ১৯৫৫ সালের ২৭ জানুয়ারি ভোরের ঘটনা। পুলিশ দ্রুত সে ফ্লাটে চলে আসে এবং লাশটি দেখে। তারা অবশ্য গভীরভাবে এ হত্যাকাণ্ডের

BanglaBook.org

ব্যাপারে প্রাথমিক অনুসন্ধান করেনি। শুধু এটুকু লক্ষ্য করল রবিনস্টোনের ঠোঁটে টেপ আটকানো রয়েছে। বিশাল বৈদ্যুতিক তার দিয়ে রবিনস্টোনের শরীর মুড়িয়ে রাখা হয়েছে, কাপড় দিয়ে তার মৃতদেহ মুড়িয়ে রাখা হয়েছে। দেয়ালে তার সুন্দর ছবি ঝোলানো রয়েছে। হাতে একটি বল। মাথায় সুন্দর টুপি, পরনে সম্রাট নেপোলিয়ানের মত পোষাক।

ঠোঁটে টেপ আর পুরো শরীর তার দিয়ে মুড়ে দেয়া রয়েছে এটা খুনের ঘটনার ক্লু হিসেবে কাজ করতে পারে। মৃতদেহ দেখতে বহু মানুষ তৃতীয় তলায় গেল। কোথায় কোন ফিঙ্গার প্রিন্টের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তা লক্ষ্য করছিল পুলিশ। খুনীর কোন হাতের ছাপ, তদন্তের জন্য বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে। একেবারে প্রাথমিক অনুসন্ধানে তদন্তকারীরা দেয়ালে সার্জ রবিনস্টোনের সম্রাট নেপোলিয়নের পোশাক পরিহিত ছবি এবং নেপোলিয়নের মতো দাঁড়িয়ে থাকা খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। তারা অবজ্ঞা করেছিল। এটা সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হচ্ছে নেপোলিয়নকে তিনি হয়তো খুব পছন্দ করতেন আর সেজন্যই তার মত পোষাক পড়তেন। তাতে কিইবা আসে যায়? বরং এখানেই ঘটনার উৎস। কেন তিনি নেপোলিয়নের মত সাজতেন? সার্জ রবিনস্টোনের জীবন কাহিনী জানতে পারলে বহু তথ্য বেরিয়ে আসবে। তার পথচলা, জীবন যাপন এবং সর্বশেষ মৃত্যুর কারণ বেরিয়ে আসবে। প্রাথমিক পর্যায়ে তদন্তে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

নেপোলিয়নের পোষাক পরিধান করে সম্রাটের মত নিজেকে ভাবা এবং সেরকমভাবে চলা হত্যাকাণ্ডের ক্লু হিসেবে অবশ্যই কাজ করতে পারে। সেটাই হতে পারে প্রকৃত ঘটনার উৎস। প্রতীক হিসেবেও কাজ করতে পারে। ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একটি আদর্শ ও নীতি মেনে চলতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যুদ্ধ জয়ই হচ্ছে ক্ষমতা ও শক্তির মূল উৎস। কিন্তু নিজেকে নেপোলিয়নের মত ভাবতেন না সার্জ রবিনস্টোন, তিনি অবশ্য বহু চিন্তা ধারা নিয়ে জীবন পরিচালনা করতেন। বহু কিছু নিয়ে ভাবতে হত তাকে। প্রথমত তিনি একজন ব্যাংকার। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থিক লেনদেন করা বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার। গুণের যেন কোন শেষ নেই। চিত্রশিল্পী জগতে তার সুনাম সর্বত্র। নারীর প্রতি দুর্বল। তিনি ছিলেন সিনেটর, রাষ্ট্রদূত, রাজনীতিবিদ এবং সমাজসেবক। কোন গুণ নেই তার- সেটাই বলা মুশকিল। তার এ বিশাল গুণ ও সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনসাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসন সবাই ওয়াকিবহাল ছিল।

BanglaBook.org

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সুখী মানুষ সাজ রবিনস্টোন

এর অন্যতম কারণ সার্জ রবিনস্টোন যা কিছু করতেন তা দ্রুত প্রচার হত। অনেক সময় নিজেই অর্থ খরচ করে প্রচার মাধ্যমের লোকদের নিয়ে এসে তিনি তার সামাজিক কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি তুলে ধরতেন। পত্রিকায় সেসব ছবি ছাপা হত। তার কোন কর্মকাণ্ড কখনোই কারো কাছে অসংলগ্ন মনে হয়নি। কোন প্রতিবেদক কখনো বিরুপ প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। তার কোন শত্রু থাকতে পারে না।

এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় সার্জ রবিনস্টোন চেয়েছিলেন ঐশ্বর্যময় ক্ষমতার অধিকারী হতে। তার মধ্যেও কিছু নেতিবাচক মনোভাব কাজ করত। তিনি অনেক সময় তার অধীনস্তদের উপর জোরপূর্বক প্রভাব বিস্তার করতেন। তিনি নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল, চাতুর্যতা দিয়েই সমাজে শীর্ষে আরোহন করেছিলেন। তার সাফল্যের কথা প্রতিনিয়ত পত্রপত্রিকায় লেখা হত। অবশ্য সবসময়ই, পত্রিকায় নিজের থেকে জানিয়েছেন তা নয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদকরা খুঁজে বের করে নিয়েছে। নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলতেন তার কতটা সত্য এবং নিজের প্রতিই তিনি কতটা বিশ্বাসী ছিলেন তা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় ছিল। দৃষ্টির অগোচরে থেকে গেছে অনেক কিছুই।

যে বছর তার মৃত্যু হয় ঐ বছরেই নিজের জীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন বই আকারে। তাকে চাপ দেয়া হচ্ছিল। প্রিয় বীর সম্রাট নেপোলিয়নের মতই ছিল সার্জ রবিনস্টোনের কাজ। তার আদর্শ নেপোলিয়ন হলেও দু'জনের দর্শন ছিল অবশ্যই ভিন্ন। উপরন্তু সময়কাল এবং স্থানের পার্থক্য বড় ব্যাপার বটে। নেপোলিয়ন রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। সেটা একটা ভিন্ন কারণ। আর সার্জ রবিনস্টোন দশ বছর বয়সে রাশিয়া গিয়েছিলেন, তবে তিনি কাইজার সৈন্যবাহিনীর হাত ধরে সে দেশে যাননি। সে সময় রাশিয়ায় চলছিল বলশেভিকদের শাসন। একটা বিষয়ে তাদের দু'জনের মধ্যে মিল পাওয়া যায় তা হচ্ছে নেপোলিয়ন যেমন রাশিয়াতে গিয়ে বিতাড়িত হন তেমনি সার্জ রবিনস্টোন কোন সামাজিক মূল্য পাননি লাল বাহিনীর কাছ থেকে। তার বাবা কোন সামাজিক মর্যাদা পায়নি রাশিয়ার শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে। রাশপুতিন বাহিনী তাকে পাগল বানিয়ে ছেড়ে ছিল।

সার্জ রবিনস্টোনের কোটে আটটি বোতাম। কোটটি বেশ বড়, বয়সের তুলনায় তার আকৃতি কিছুটা ছোট হওয়ায় কোট পরিধান করলে তাকে বেমানান লাগত। ফিনল্যান্ডের খাড়ি অঞ্চলে গলফ মাঠে ছোট্ট ঘোড়ার উপর কোট ঝুলিয়ে রাখতেন সার্জ রবিনস্টোন। তিন ঘণ্টা গলফ মাঠে কাটাতেন। সমাজতান্ত্রিক বাহিনী তার পাশেই সব সময় অবস্থান করত। লাল বাহিনী একটা বিষয় লক্ষ্য

BanglaBook.org

করত সার্জ রবিনস্টোনের কোটের বোতাম হীরক খচিত। যাহোক তার রাশিয়া সফর বিরক্তির মধ্যেই শেষ হল। ব্যবসায়িক কোন সুবিধা আদায় করতে পারেননি তিনি।

দশ বছরের বালক সার্জ রবিনস্টোন রাশিয়া সফরের কয়েক মাস পর তার বাবা-মা এবং বড় ভাই আন্দ্রের সাথে স্টকহোমে চলে গেলেন। সেখানে তার সুন্দর সময় কাটে। পনের বছর বয়সে ভিয়েনায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ ভিয়েনাতেই জন্ম হয়েছিল রবিনস্টোনের। তার ইচ্ছা ছিল মনস্তাত্ত্বিকবীদ হবেন। এখানে তার জন্মদিন পালিত হয়। বাবা-মা ও বড় ভাই তার কাছে জানতে চায় জন্মদিনে সে কি উপহার আশা করে?

কথাটা শুনেই সে বলল,

"উপহার?"

তার বাবা বলল,

"সাইকেল দেব তোমাকে? তার থেকেও যদি আরো বড় কিছু দেই, কেমন হয়? ধর রোলস্ রয়েস গাড়ী।"

সার্জ রবিনস্টোন বলল,

"কি কারণে এত বড় উপহার? আমার শংকা হচ্ছে। চিন্তায় পড়ে গেলাম।"

সার্জের বাবা তার এ কথায় আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠল। ছেলের ছবি আঁকা এবং চিত্র শৈলীতে তিনি মুগ্ধ। আর সে কারণেই বেশ কয়েক মাস পর বাবার কাছ থেকে সার্জ গাড়ী উপহার পেল। রোলস্ রয়েলস চিরজীবনের জন্য তার সাথী হল।

সে সুখকর সময়ের স্মৃতি স্মরণ করে সার্জ রবিনস্টোন বলেছিল,

"শিল্পকলার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অ্যাডলার যদি আমাকে দ্রুত সুস্থ করে তুলতেন তাহলে আমি অসাধারণ মানুষে পরিণত হতাম, তিনি আমার মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো বুঝার চেষ্টা করেছিলেন। আমি লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলাম।"

সার্জ রবিনস্টোন অসাধারণ চিত্রশিল্পী হোক সত্যি কি ড. অ্যাডলার চেয়েছিলেন? অবশ্য তার অসাধারণ মেধা সেটাই ছিল প্রধান বিচার্য বিষয়, আর তা যদি ঘটত সেটা হত সেরা একটা কিছু। কিন্তু সময়, বয়স এবং ইচ্ছার সাথে সাথে ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক কমে যায় তার। এক পর্যায়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন।

সার্জ রবিনস্টোনের দীর্ঘ অতীত জীবন নিয়ে বহু গবেষণা এবং তদন্ত করে পুলিশ শুধু সময়ই পার করল। কিছুই উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি তারা। অসামঞ্জস্য কিছুই পায়নি। কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি পুলিশ। একটা বিষয় পরিষ্কার তা হচ্ছে সার্জ রবিনস্টোনের কোন শত্রু ছিল না। অবশ্য রাশিয়া

BanglaBook.org

ভ্রমণের সময় বলশেভিক পার্টির সদস্যদের সাথে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সেটা শত্রুর পর্যায়ে চলে যায়নি।

১৮ বছর বয়সে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন সার্জ রবিনস্টোন। বড় ভাই আন্দ্রে তার পড়ালেখার সব খরচ বহন করেন। বড় ভাই ঋণবাবদ তাকে এ অর্থ সাহায্য করেছিলেন। যখন সার্জ টাকা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তখন তাদের সম্পর্কে চীড় ধরে। সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটতে বেশি দেরি হয়নি। সার্জ যখন প্রাপ্তবয়স্ক তখন আন্দ্রে তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করল, তার প্রচুর টাকা চুরি করেছে সার্জ। একথা সত্য ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত সার্জ রবিনস্টোনের বড় ধরনের কোন শত্রু ছিল না।

এক অর্থে বলা যায় তার ভাই তার প্রথম শত্রু। ভাইয়ের এ অভিযোগ আদালতের রেকর্ড বুক থেকে লিপিবদ্ধ করল পুলিশ। তার জন্মদিনে ১০ লাখ ডলার উপহার দেয়া হয়েছিল। এ বিশাল অর্থ প্যারিস ব্যাংকে ডিপোজিট করেছিল সার্জ। ব্যাংক থেকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেন তিনি। তার এ ডিপোজিট স্কিম গোপন থাকে। কখনই দু'একজন ছাড়া আর তেমন কেউই জানতে পারেনি। ফ্রাঙ্কো এশিয়াটিক ব্যাংকে জমা রাখেন তিনি। চায়নায় এ ব্যাংকের শাখা ছিল। চিয়াং কাইশেক ব্যাংক তাদের আর্থিক লেনদেনকারি হিসাবে এ ব্যাংকের সাথে কাজ করে। চিয়াং কাইশেক ব্যাংকের দেনার পরিমাণ এত বেশি ছিল, এক পর্যায়ে কুঋণের জালে আটকে পড়ে যায়, এ কুঋণ মোকাবিলা করতে বাজারে বণ্ড ছাড়ে তারা। এ আর্থিক বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে চায়না সরকার ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং তা পরিশোধ করে বাজারে নতুন বণ্ড ছাড়ে। চায়নার এ আর্থিক বিপর্যয়ে অনেক অর্থনীতিবিদ চিন্তিত হলেও ব্যাংকের তরুণ ম্যানেজার সমঝোতার চেষ্টা করেন। সার্জের ব্যক্তিগত ধারণা ছিল চায়নার পক্ষেও ঋণের বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। বাজারে প্রচলিত নতুন বন্ডের সুদ প্রদান করতে গিয়ে আর্থিকভাবে সরকার আরও দেউলিয়া হয়ে পড়বে।

চায়নার অর্থনীতিতে ব্যাংকিং অবস্থার গতি প্রকৃতি পরবর্তীতে সবার জানা ছিল। সে এক লম্বা ইতিহাস। বাজারে নতুন বন্ডের একটা বিশাল অংশ কিনে নেন সার্জ। বাজারে যে মূল্য তার থেকে কিছুটা বেশি দামে কিনে নেন বন্ডগুলো। এর থেকে মুনাফা পেতে বেশি দেরি হয়নি সার্জের। চায়না সরকার গ্রাহকদের যখন নতুন বন্ডের সুদ দিতে শুরু করে এতে করে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় ফ্রাঙ্কো এশিয়াটিকের ম্যানেজার রবিনস্টোন। বিশাল অর্থ লেনদেন করতে পেরে তিনি নিজেই ধন্য এবং গর্বিত হন।

BanglaBook.org

তিনি বলেন,

"আমার হাতে সরকারী বন্ড ছিল। সেগুলো বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করেছি।"

এটা কি অবৈধ? অনৈতিক? ব্যাংকিং আইনে ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা এভাবে বন্ড বিক্রি করে মুনাফা তুলে নিতে পারে না। এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু এতেও তার খুন হওয়ার মূল কারণ উদ্‌ঘাটিত হয় না। বিনিয়োগকারীরা, ফ্রাঙ্কো এশিয়াটিক ব্যাংক, সার্জ অথবা চায়না সরকার কেউই আর মূল্যহীন বন্ড নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি। এর ফলে দাঁড়াল, সার্জ রবিনস্টোন আর্থিকভাবে ধনকুবেরে পরিণত হলেন। এরই পাশাপাশি ফ্রান্স সরকার তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করল।

ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হওয়ার আরো একটি কারণ ছিল। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে লেভেনের স্ত্রীর সাথে সার্জ রবিনস্টোনের ঘনিষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাদের এ সম্পর্ক প্রেম-ভালবাসা পর্যায়ে গড়ায়। এ কারণেই তাকে ফ্রান্স থেকে বের করে দেন পিয়েরে লেভেন।

এ পর্যায়ে সার্জ রবিনস্টোন ইংল্যান্ডের রাজনীতিবিদদের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি লন্ডনের একটি খনিজ কোম্পানীর সাথে স্টক ব্যবসায় শুরু করেন। খনিজ কোম্পানী কোরিয়াতে স্বর্ণের খনির মালিকানাধীনের একটি প্রতিষ্ঠান। এটা একটা বিশাল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানী, সর্বাধিক পরিচিত।

ইংল্যান্ডের আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের কেন্দ্রভূমিতে এ স্বর্ণ খনির অফিস্। সার্জ প্রচুর বিনিয়োগ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় কয়েক লাখ ডলার বিনিয়োগ করেন। সার্জের অবশ্য এ বিনিয়োগের তেমন ইচ্ছা ছিল না। সার্জ চেয়েছিলেন স্বর্ণের খনির স্টক ব্যবসা নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে। ব্যবসায়ের যেকোন প্রকার ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। ঝুঁকির মধ্যেই তিনি আনন্দ পান এবং তার মধ্য থেকেই অনেক বিনিয়োগকারীকে নিঃস্ব করে তিনি মুনাফা বের করে আনেন। এ ব্যাপারে তিনি খুবই অভিজ্ঞ। কখনোই ক্ষতির শিকার হন না। এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যাতে ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব। তার এ পদ্ধতিকে রবিনস্টোন থিওরি বলা যায়। তার ভাগ্যই অনেক সুপ্রসন্ন। এ সূত্রের বলেই বিশাল ব্যবসায়ীতে পরিণত হন তিনি। তার মৃত্যুর চারমাস পর এসব কিছু তদন্ত কারীরা জানতে পারল। তিনি প্রকাশ করেছিলেন, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের পত্রিকা *"ফরচুন।"* ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নিয়মিত এ পত্রিকা পড়ত এবং তারা রবিনস্টোনের কৌশল সম্পর্কে জানতে পারত। সেরকম পদ্ধতি গ্রহণ করে তারাও ব্যবসায় ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে আনত।

রবিনস্টোনের নিজস্ব বক্তব্য হচ্ছে,

BanglaBook.org

"আমি কল্পনা করে কোন সিদ্ধান্ত নেই না। নিজেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করি। বিনিয়োগের আগে শুধু বাজার ব্যবস্থাই নয়, যে দেশে বিনিয়োগ করি, সে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি সবকিছু পর্যালোচনা করি।"

রবিনস্টোনের দীর্ঘ ক্যারিয়ার বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার, তিনি খুবই সফল ব্যবসায়ি। সার্জের শারীরিক অসুবিধার মধ্যে ছিল মাঝে মধ্যেই পিঠে ব্যথা হত তার।

সার্জের কৌশল ছিল একটার পর একটা ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। রবিনস্টোন তার ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে গোপন সূত্রে জানতে পারলেন কিভাবে অন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে? এ পরামর্শ তার ব্যবসায় বিনিয়োগে বিশেষভাবে কাজ লেগেছে। এ মূল্যবান তথ্য পরবর্তীতে কিছুটা সংস্কার করে ফরচুন পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন সার্জ রবিনস্টোন। এতে লাভবান হয়েছে ব্যাংকার, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দালাল এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এদিকে শেয়ার ব্যবসায়ীরা অর্থ বিনিয়োগের এ নোংরা পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তারা অনেকে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিল এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সবকিছু অস্বীকার করল। অবশ্য তদন্তের আশ্বাস দিল তারা।

অর্থ পাচার সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে এক কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের এক সদস্য জেলে গেলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে, তিনি কোম্পানীর অর্থ আত্মসাৎ এবং জালিয়াতি করেছেন। স্বনামে, বেনামে শেয়ার বিক্রি করেছেন। অনেকের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উঠলেও যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তারা বেঁচে যায়। তাদের আর জেল হয়নি।

সার্জ রবিনস্টোন ব্যাংকিং দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকলেও তিনি একটি নিয়ম মানতেন। তিনি তার নিজস্ব সূত্র মত চলতেন। যে কোম্পানীর শেয়ার ভবিষ্যতে মুনাফা করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং কতটা মুনাফা হতে পারে সেভাবেই শেয়ার স্টক করতেন। শেয়ারের দাম যখন কমে যেত তখনই তিনি প্রচুর শেয়ার কিনতেন। তারপর শেয়ারের দাম কিভাবে বৃদ্ধি করতে হয় সে অনুযায়ী গেম খেলতেন। তাতে প্রচুর মুনাফা হত।

ধারণা করা সত্যি সম্ভব ছিল না, এভাবে সার্জ কত লাখ ডলার বাজার থেকে তুলে নিয়েছিলেন। তার মুনাফার পরিমাণ সাধারণভাবে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কত মানুষকে শেয়ার কিনতে তিনি প্রভাবিত করতেন তা ভাবাই মুশকিল।

১৯৩৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মহামন্দার সময়ে সার্জ রবিনস্টোন যদি খুন হতেন তাহলে এ নিয়ে পুলিশ বিভাগকে বেশী ভাবতে হত না। কারণ শেয়ার বাজার অধঃপতনে অনেকেই খুন হয়েছিল সেটাই ছিল তখনকার স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু

BanglaBook.org

তিনি খুন হন ১৯৫৫ সালে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্র প্রবল শক্তিতে এগিয়ে চলেছে। পুঁজিবাজারের অবস্থা রমরমা। এমনকি হতে পারে, সামরিক বাহিনীর কোন কর্মকর্তা তার প্রতি প্রতিশোধ নিতেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে? তদন্তকারীরা এ বিষয়টাও ভাবছে বটে। তবে এর সম্ভাবনা বা কতটুকু?

ফ্রান্স থেকে যখন তিনি বিতাড়িত হন তখন যুক্তরাষ্ট্র যে তাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে তা নয়। এর একটি কারণ যুক্তরাষ্ট্র তাকে সহজে মেনে নেয়নি। তার জন্ম রাশিয়ায়। অবশ্য তার জন্ম দেখানো হয়েছিল পর্তুগালে। যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে পর্তুগালের নাগরিক হিসাবে পাসপোর্ট প্রদর্শন করেন। ব্যাপক তদন্তে বেরিয়ে এসেছে তিনি রাশিয়ার নাগরিক। অবশ্য ১৯৩৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে রূপান্তরবাদের অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে সবকিছুর মূলে রয়েছে অর্থ, লোভ-লালসা, সম্মান, প্রতিপত্তি এবং বিশাল ধনকুবেরে পরিণত হওয়া।

সার্জ নিজেই বলতেন,

"তার কোন রূপান্তরবাদ ঘটেনি।"

তিনি নিজেকে পর্তুগীজ ভাবতেই ভালবাসতেন। তারপরেও এ পরিচয় গোপন রাখতেন কারণ পরিবারের সম্মানের কথা চিন্তা করেই তা করতে হত তাকে। এখন তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে, চলে গেছেন পরপারে।

বাস্তবিক অর্থে তার মধ্যে একটা পাপবোধ কাজ করত। আর সেটা ছিল তার মায়ের কারণে। তার মায়ের সাথে পর্তুগীজ এক ব্যক্তির সাথে প্রেম ভালবাসা ছিল। তাদেরই পরিণয়েই সার্জ রবিনস্টোনের জন্ম। এক অর্থে তিনি অবৈধ সন্তান। অবশ্য তার বাবা-মা কখনো সেটা মনে করত না। তারা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছিল। তাকে ঠিকমত লালন-পালন করে বড় করেছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি পর্তুগীজ। আর পর্তুগীজদের প্রতি ছিল তার সব শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসি হয়েও তিনি চেষ্টা করেছেন সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে পর্তুগীজদের প্রভাব বজায় রাখতে। তাদের সাথেই সব সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এতকিছুর পরও তা চিরস্থায়ী হয়নি। পরবর্তীতে দেখা গেছে, বহু পর্তুগীজ ব্যবসায়ী তাকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। সার্জ রবিনস্টোন তাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধি ও কৌশল দিয়ে লড়াই করেছেন। টানা এক দশক লড়েছেন। কখনও বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন, কখনও অর্থ ব্যয় করেছেন। অর্থ দিয়ে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করেছেন। বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সাথে অন্তরঙ্গতা ছিল তার। অনেকেই ছিল সুপরিচিত। রাজনীতিবিদদের সাথেও তার সখ্যতা ছিল। অনেকেই এটা অন্তত বিশ্বাস করত রবিনস্টোনের উপর আস্থা রাখা যায়। কিন্তু এতে করে কি

BanglaBook.org

সার্জ রবিনস্টোন সম্পর্কে সব তথ্য জানা যায়? তার বিশাল অর্থের উৎস কোথায়? তাকে কিভাবেই বা সমাহিত করা হল? তার সাথে কোন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর গোপন চুক্তি হয়েছিল কি?

এ-ধরনের চুক্তির ফসল–

"প্রতিপক্ষ অনুভব করল তারা কিছু পাবে না এবং তাদের বিশাল অর্থ জলাঞ্জলি যাচ্ছে তখনই অঘটন ঘটেছে।" তদন্তকারীরা অন্তত তাই মনে করেছিল।"

১৯৫৫ সালে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই সার্জের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা হুমকি হয়ে উঠেছিল। তার ইচ্ছা ছিল ফেব্রুয়ারির দিকে আদালতে গিয়ে নাগরিকত্ব বিষয়ক শুনানীতে অংশ নেবে। সে সময় তার জীবনে আর আসেনি। একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল, কোনভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে বাস করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পাসপোর্ট জালিয়াতি আর শত রকমের মিথ্যা তথ্য দিয়ে দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছিলেন। এভাবেই পলায়ন মনোবৃত্তি নিয়ে নিজের কাজ হাসিল করছিলেন তিনি। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ যখন পুনঃতদন্ত করল, তারা দেখতে পেল, তার পর্তুগীজ পাসপোর্ট জালিয়াতি করা। সূক্ষ্ম বিচার করলে এবং কারো দ্বারা প্রভাবিত না হলে সার্জ রবিনস্টোনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা আর সম্ভব নয়।

একটা পর্যায়ে সার্জ সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে দূরে সরে যেতে চেয়েছিলেন। পরিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন তিনি। এজন্য বন্ধুদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। বন্ধুদের কাছ থেকে যেসব তথ্য পেতেন তাতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, পর্তুগীজ পাসপোর্ট রাখা তার জন্য হুমকি স্বরূপ। অভিবাসিত আইনে তিনি আটকে যাবেন। তিনি কি ব্ল্যাকমেইল করেছিলেন। সম্ভবত কারো ভুল পরামর্শে তিনি এ কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে জলজ্যান্ত কোন সাক্ষ্য নেই। শুধু ধারণা করা যায় মাত্র। এর ফলে নতুন করে সন্দেহের বীজ বপন হতে পারে। তাকে কে খুন করতে পারে? প্রথম সন্দেহটা এসেছে তার ভাই আন্দ্রের প্রতি। কিন্তু সেটাও যথেষ্ট যুক্তিতর্কের মধ্যে পড়ে না। তারপর সন্দেহের তালিকায় ছিলেন সার্জের মা। তার মায়ের বন্ধু-বান্ধব কি এ কাজ করতে পারে? সার্জের মায়ের সাথে যেহেতু দীর্ঘদিন পর্তুগীজ ব্যবসায়ীর সম্পর্ক ছিল তিনি কি এ কাজ করতে পারেন? তবে তার মায়ের এ অনৈতিক সম্পর্কের কারণে সার্জের কোন ক্ষতি হতে পারে না, অন্তত তদন্তকারীরা তাই মনে করেন। খুন হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সার্জ যে ফ্লাটে থাকতেন সে ফ্লাটের সর্বোচ্চ তলায় থাকতেন তার মা। তার সাথে থাকতেন তার বোন।

এই দু'বৃদ্ধা মহিলা সার্জের খুন হওয়ার পর পুলিশি তদন্তে পূর্ণভাবে সাহায্য করেছেন। সার্জের মা মিসেস রবিনস্টোনের কাছ থেকে জানা যায়, তিনি রাত

BanglaBook.org

২টায় সন্তানের চিৎকার শুনেছেন। লাশের ময়না তদন্তে দেখা গেছে রবিনস্টোনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে রাত ২টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যে। ছেলের চিৎকারে একবার নিচে এসে দেখতে চেয়েছিলেন মিসেস রবিনস্টোন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর থেমে যাওয়ায় তিনি আর নামেননি। ভেবেছিলেন হয়তো কোন ভয়ের স্বপ্ন দেখেছে।

মিসেস রবিনস্টোনের ৮২ বছরের বৃদ্ধা বোন বলেন,

"গভীর রাতে তিনি এক রহস্যময় নারীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেছেন।"

তিনি কেন রবিনস্টোনের ঘরে ঢুকলেন তা জানা যায়নি। তদন্তে যেটুকু জানা গেছে, সে রহস্যময়ী মহিলা ঘরে ঢুকেই কয়েক রাউন্ড দেয়, তারপর টানতে টানতে সার্জকে বাথরুমে নিয়ে যায়। সম্ভবত সেখানেই তাকে হত্যা করে। সে সময় রবিনস্টোন বেশ কয়েকবার চিৎকার করে। তার সাথে জোরপূর্বক দৈহিক মিলন ঘটায়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার ঘর থেকে কোন কিছুই চুরি হয়নি। রহস্যময়ী নারী, যে তাকে খুন করেছে, প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হলেও কেন তাকে খুন করেছে তা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য। কে এ রহস্যময়ী মহিলা? পুরো ফ্ল্যাটের নিরাপত্তা কর্মীরাও কেউ কখনো তাকে দেখেনি। এটাকে ডাকাতি বলতেও কেউ রাজি নয়। কারণ ঘরের কোন কিছুই লুটপাট হয়নি। মূল্যবান জিনিসপত্র সবই ঠিক আছে। এমনকি জোর করে ঘরে প্রবেশ করেছে রহস্যময়ী নারী তারও কোন প্রমাণ মেলে না।

ঘরের দরজা জানালা কোথাও ভাঙ্গা নেই। সম্ভাব্য সব সন্দেহগুলো বাদ দিয়ে তদন্তকারী উপসংহার টেনে বলল,

"খুনী অবশ্যই সার্জ রবিনস্টোনের খুবই পরিচিত। অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করেই সে তার রুমে প্রবেশ করেছে।"

কিন্তু কে সেই নারী? এটাই রহস্যময়। তদন্তকারীরা সার্জ রবিনস্টোনের ব্যক্তিগত সব ফাইল খুলে দেখল। সেখান থেকে যতটা সম্ভব বন্ধু-বান্ধবের নাম ও ঠিকানা লিখে নিল। তদন্ত কাজে এটা সাহায্য করবে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কাছে সার্জ রবিনস্টোনের একান্ত গোপনীয় ব্যবহারকৃত ছোট একটি কালো বই তুলে দেয়া হল। এ বইতে তার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী বর্ণনা রয়েছে। এখান থেকেই সম্ভাব্য সন্দেহভাজনকে খুঁজে বের করা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা নতুন করে সৃষ্টি হল। এ বইটি পকেট সাইজ নয়। আর এতে ১০০টির বেশী নাম বর্ণনা করা হয়েছে। তার খুনের সাথে নিশ্চয়ই এত লোক জড়িত নয়। আর এত লোককে সন্দেহ করা এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভবও নয়। আর সেটা শোভনীয় হবে না।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পুলিশ রবিনস্টোনের মৃতদেহ তার বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছে

পুলিশও কখনো এ ধরনের সূচীপত্র বিষয়ক বই দেখেনি। ফলে তারা কোথা থেকে শুরু করবে তাই বুঝে উঠতে পারছিল না। বর্ণনাক্রমে সাজানো ছিল না। কোন বিশেজ্ঞের সাহায্য নেবে কিনা তাই ভাবছিল, এটাও এক প্রকার বিড়ম্বনা। আর একসাথে বহুলোককে সন্দেহ করলে অনেকেই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবতে পারে।

সার্জ রবিনস্টোন এমন কারো নাম বলেননি, যে তাকে নিয়ে সন্দেহ করা যায়। বইতে যাদের নাম লেখা ছিল তারা সবাই তার বন্ধু। ফলে তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে এটা কল্পনাতেও আসে না। বাস্তাবিক অর্থে রবিনস্টোন চিরতরে চলে গেছেন এবং সেটাই সবাই ভুলে যেতে বসেছে। তার অন্তে্যষ্টিক্রিয়ায় যারা উপস্থিত থাকতে পারেননি তারা অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন। অনেকেই ওয়াশিংটনে থাকালেও তাদের পক্ষে শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেয়া সম্ভব ছিল না। কলামিস্ট, প্রতিবেদক, নয়জন রাষ্ট্রদূত, এক ডজন সিনেটর, সংসদ প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং লবিস্ট উপস্থিত থাকতে পারেননি। শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, রবিনস্টোন আর নেই। বাস্তবতা এটাই। এদিকে সমাপনী এ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের প্রতি ছিল পুলিশ কর্মকর্তাদের বিশেষ দৃষ্টি। কে, কি ধরনের আলোচনা করছিল তা জানার চেষ্টা করছিল পুলিশ।

নতুন এক তথ্য জানা গেল। এক যুবক জানাল নিউইয়র্ক সিটিতে বিএমটি সাবওয়ে হচ্ছে। এ কাজে একত্রে করবে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এবং পোস্টাল টেলিগ্রাফ। এ সাবওয়ে নির্মাণে এ দু'গোষ্ঠীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন রবিনস্টোন। তার হত্যার পিছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে। তবে তিনি কখনো তার সোর্সের কথা প্রকাশ করেননি। গোয়েন্দারা অপরাধ জগতের সন্দেহ তালিকার শীর্ষে থাকা ব্যক্তিদের খোঁজ খবর নেয়ার চেষ্টা করল। তারা এটাও খোঁজ নিতে থাকে কোন অর্থ লেনদেন অথবা জালিয়াতি হয়েছিল কিনা। এটা একেবারে অসম্ভব নয়। এমনও হতে পারে শত্রুপক্ষের দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ না করায় তাকে ভিন্ন নাটক সাজিয়ে মহিলা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এবং পোস্টাল টেলিগ্রাফের সাথে সার্জের সেটাই ছিল শেষ বৈঠক।

সার্জ তাদেরকে প্রস্তাব দিল,

"শেয়ার তিনভাগে ভাগ হবে। সাবওয়ে তৈরি করতে তিনজনই অর্থ বিনিয়োগ করবে।"

এটাই ছিল তার মৃত্যুর কারণ।

পুলিশের ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ দু'গোষ্ঠীকে তেমন কিছুই করা যায়নি। তারা তদন্তে তেমন সহায়তা করেননি। গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাজের

BanglaBook.org

সমালোচনা করাও সুবুদ্ধির কাজ হবে না, এটা অন্তত বুঝতে পারল ফরচুন পত্রিকার বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিবেদকরা। তারা বুঝতে পারল সাবওয়ে তৈরীতে রবিনস্টোনের জড়িত থাকাই ভুল ছিল। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এবং পোস্টাল টেলিগ্রাফ এ দুটি প্রতিষ্ঠান অবশ্য তার খুনের ব্যাপারে নিজেদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছিল।

যখন কোন নির্যাতিত ব্যক্তি বিভিন্নভাবে কোন গোষ্ঠীর দ্বারা হুমকির শিকার হয় তখন সে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে সাহায্য না প্রত্যাশা করে বরং নিজের কোন বাহিনী থাকলে তাদের কাছ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কারণটি খুবই সহজ। যদি কোন মানুষ অতীতে দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের সাথে জড়িত থাকে তার বর্তমান সময়ও একই ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মধ্য থেকে বের হতে পারে না সে। এটা ধারণা করা তাই খুবই যুক্তিসংগত যে সার্জ রবিনস্টোন আন্ডারওয়ার্ল্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তার হত্যার পিছনে আন্ডারওয়ার্ল্ড গোষ্ঠী জড়িত থাকা বিচিত্র কিছু নয়। সেখানে হত্যা, খুন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

রবিনস্টোনের মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে যত প্রশংসা সব এসেছে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। সাংবাদিকদের কাছে তিনি শেয়ার বাজারের দালাল, স্ট্যানলাল কে স্ট্যানলাল গোষ্ঠী তারাও সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

কে স্ট্যানলাল বলেন,

"আমি মনে করি এ হত্যাকাণ্ডের অপরাধীকের খুঁজে বের করা অবশ্যই পুলিশের নৈতিক দায়িত্ব।"

ব্যবসায়ীরা যেমন রবিনস্টোনের বন্ধু ছিল, আবার অনেকেই তার শত্রু ছিল বটে। প্রশ্ন হচ্ছে কে তার শত্রু হতে পারে? আরো একটি বিষয় সন্দেহের তালিকায় যুক্ত করা হল। ১৯৪৭ সালে সার্জ রবিনস্টোন গ্রেফতার হন এবং তাকে জেলে পাঠানো হয়। লুইসবার্গের জেলে তাকে শাস্তিস্বরূপ পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যে খসড়া তৈরী করা হয়েছিল তিনি তা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অনেকেই সে খসড়া এড়িয়ে গেলেও রবিনস্টোনের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। তার মত ব্যক্তিত্ব এবং সুপরিচিত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়া যায় না। আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করার আগেই তিনি এ-১ শ্রেণীভুক্ত নাগরিক হন। এতে করে রাষ্ট্রের সব সুযোগ সুবিধা পান তিনি। জেলখানায় তাকে সেবা যত্ন এবং পরিচর্যা করা হয়। এ-১ নাগরিক হওয়ায় তিনি যেকোন পেশায় যোগ দিতে পারেন। এ কারণে তিনি ১৫ বার পেশা বদলেছেন। সেন্যবাহিনী কোন গ্রুপ যদি তাকে দেশে রাখতে চায় অন্য গ্রুপ তাকে বের করে দিতে নির্দেশ প্রদান করে।

BanglaBook.org

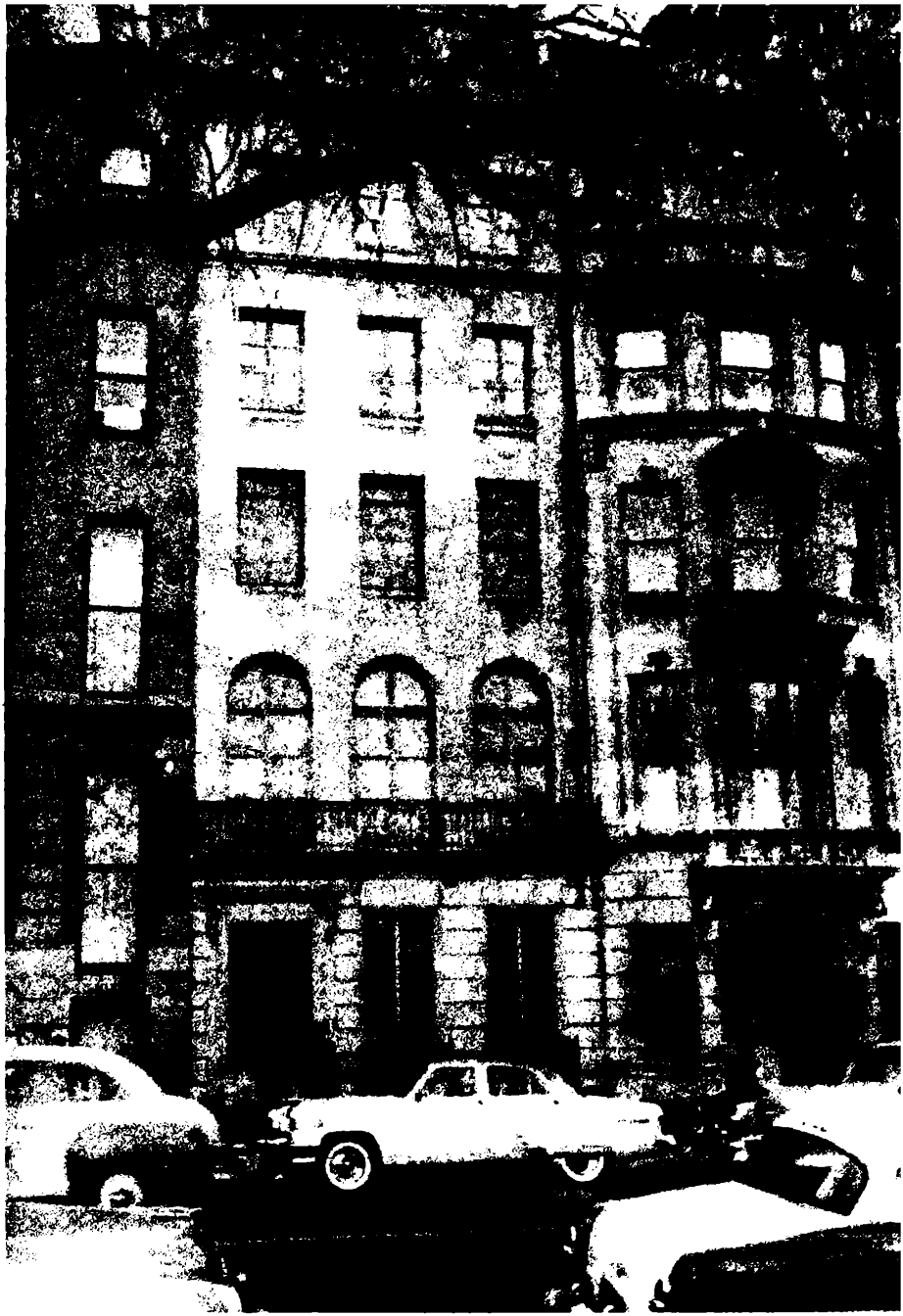

পঞ্চম এ্যাভিনিউয়ে বাস করতেন রবিন স্টোন। এখানেই তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়

মি. স্ট্যানলির মতে,

"রবিনস্টন ছিলেন নিরপেক্ষ। তিনি কোন প্রকার যুদ্ধ পছন্দ করতেন না।"

সব কিছুতেই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পেরেছেন রবিনস্টোন তা নয়। তার নিজস্ব অভিযোগ ছিল যুক্তরাষ্ট্র তার নিজ বাহিনীর জন্য নিজ দেশে ফ্রন্ট তৈরীতে পারঙ্গম নয়। তবে বিমান বাহিনী অনেক সমৃদ্ধ। টেলরক্রাফট কর্পোরেশন অত্যাধুনিক বিমান তৈরী করেছে।

আদালত তার বিরুদ্ধে নির্দেশ দিয়েছিল টেলরক্রাফট কোম্পানী থেকে বিমান কেনা দোষের কিছু নয় তবে তাকে ইউনিফর্ম ছাড়া থাকতে হবে। অভিযোগ শুধু সার্জ রবিনস্টোনের বিরুদ্ধে নয় টেলরক্রাফট কোম্পানীর সভাপতির বিরুদ্ধেই একই অভিযোগ ওঠেছিল। অর্থ প্রতারণার সাথে জড়িত, এ অভিযোগ ছিল তাদের বিরুদ্ধে। দু'জনকেই জেলে পাঠানো হয়। আদালতের এ রায় মেনে নিতে পারেনি টেলরক্রাফট কোম্পানীর সভাপতি।

তিনি আপিল করে বললেন,

"সার্জের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কখনো ছিল না।"

সার্জের জীবনের শেষ বছরটি ছিল অত্যন্ত জটিল। বহু ঘটনা রটনার জন্ম দিয়েছেন তিনি। যার অনেক কিছুই তিনি প্রকাশ করেননি বা করে যেতে পারেননি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, দু'জন ব্যক্তি তাকে প্রহার করেছিল। যাদেরকে তিনি কখনোই চিনতেন না এবং শনাক্ত করতে পারেননি কোনদিন। অসমর্থিত সূত্র থেকে জানা যায়,

"টেলিফোন বুথে এক ব্যক্তিকে হুমকি দিয়েছিলেন। একপর্যায়ে সে ব্যক্তির মুখের উপর এক হাজার ডলার ছুঁড়ে ফেলে দেন।"

আরো একটি ব্যাপারে অনেকেই দৃষ্টি দিলেও পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এটা তাদের কাছে নিছক গল্প মনে হয়েছে।

কল্পকাহিনী ছিল এরকম,

"রবিনস্টোন নববর্ষের আগের রাতে রাশিয়া থেকে সাত সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে এসেছিল। তাদের সাথে আনন্দে উল্লাসে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন। এই ঘটনা তার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে ঘটেছে।"

পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থা সর্বশেষে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করল তা হচ্ছে পেশাদার কোন খুনী রবিনস্টোনকে খুন করতে পারে। এমন অনেক খুনী রয়েছে যে খুন করা তাদের পেশা ও নেশা। এটাও একটা কারণ হতে পারে। তার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে তিনি কখনো মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, এজন্য তার এ পরিণতি হবে।

BanglaBook.org

সার্জ রবিনস্টোন বহু অর্থবিত্তের মালিক হলেও তার মনেও কষ্ট ছিল। তার জীবন ছিল একাকী ও নিঃসঙ্গ। তার জীবনের শেষ আট বছর নীরবে কেটেছে। ১৯৪৭ সালে তার স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে চলে যায়। তার উশৃঙ্খল জীবনই এজন্য দায়ী। মানুষের প্রতি পুলিশ যতই দুর্ব্যবহার করত এবং মানুষকে কারণে অকারণে জেরা করত তারপরও পুলিশের মধ্যে কিছু মানবিক গুণাবলী রয়েছে। তারা একটি মত পোষণ করল, রবিনস্টোনের জীবন বড়ই বিচিত্র। সার্জের জীবনে নারী ছিল ছেলেখেলা। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিরাতে অর্ধ ডজন নারীর সাথে মিলিত হতেন তিনি। আর একটি বিষয় রবিনস্টোনের একটা অভ্যাস ছিল প্রায়ই প্রতিরাতে বাড়ির মূল দরজার চাবি বদলে ফেলতেন। যখনই কোন গ্রুপ বদল করতেন তখনই সে পুরাতন চাবি ফেলে দিতেন। নতুন তালা-চাবি লাগাতেন।

সুন্দরী তরুণীদের যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে তারপর তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। তিনি তাদের চিরতরে প্রত্যাখ্যান করতেন। প্রতিনিয়ত নারী পরিবর্তন আর নতুন তরুণী নিয়ে আনন্দে মেতে উঠাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘরের চাবি এবং নারী বদলানো তার স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। অনেকের কাছেই চাবি পৌঁছে গিয়েছিল। যে কেউ এ চাবি ধার নিয়ে রবিনস্টোনের ঘরে প্রবেশ করতে পারত।

তার এ অবাধ যৌনাচার এবং চাবি বদল এসবও তদন্তের আওতায় নিয়ে আসা হল। পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারল, সর্বশেষ যে তরুণী এ ঘরে প্রবেশ করেছে তার নাম এসেন গার্ডনার। সে মডেল তারকা। সে ঐ রাতে সার্জ রবিনস্টোনের সাথে নেচেছে এবং দৈহিক মিলন করেছে। গাড়ী চালক নিনো লারা এ মডেল তারকা এসেন গার্ডনারকে রাত ১২টা ৩০-য়ে রবিনস্টোনের বাড়ির সামনে নামিয়ে দেয়। নিনোর দেনা পাওনা ভালমত মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। গার্ডনারকে তা পরিশোধ করতে হয়নি।

গার্ডনারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বলে,

"ঐ রাতে রবিনস্টোনের সাথে সে ছিল বটে। সে রাত ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ছিল। ঐ সময় পর্যন্ত কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তারপর বাড়ি চলে আসি।"

তার বক্তব্যের যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। আরেক সুন্দরী তরুণী এবং প্রমোদবালা প্যাট ওরিকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাকেও রবিনস্টোন প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন রাত ২ টা ৩০মিনিট। ফোনে তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে প্যাট ওরি। রবিনস্টোনের জন্য এটা চরম অপমানের ব্যাপার। এর দু থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে রবিনস্টোন খুন হন।

BanglaBook.org

সার্জের গোপন বই থেকে ৫০০ সুন্দরী রমণীর ঠিকানা নিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এজন্য গোয়েন্দা বিভাগ ৫০টি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করেছিল। এসব সুন্দরী রমণীদের অনেক রকম প্রশ্নও জেরা করা হয়েছিল কিন্তু কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এদের কেউই খুনের সাথে জড়িত নয়। অবশ্য সন্দেহের তালিকায় সর্বশেষ যে নামটি এসেছে তিনি হচ্ছেন হেরমেন শুলজ। এ নাম রবিনস্টোনের বইয়ের তালিকা ছিল না। শুলজ ছিলেন রবিনস্টোনের এক নম্বর শত্রু। ডিস্ট্রিক্ট অফিস থেকে এ তথ্য জানা গেছে। পঞ্চাশ বছর বয়স্ক এ মানুষটি অপরাধ জগতের সাথে জড়িত। পুলিশ তার বাসায় হামলা করে। সেখানে গিয়ে দেখতে পায় ঘোড়া, সাব মেশিন গান, পিস্তল, রিভলবার, ব্ল্যাকজ্যাকেট এবং সুইচ ব্লেজ।

শুলজকে পুলিশ জেরা করে। কেন সে এসব অবৈধ অস্ত্র রেখেছে, তা জানতে চায়।

জেরার মুখে শুলজ বলেছিল,

"ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল সে।"

এটা ঠিক রবিনস্টোনের হত্যার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সেটাই ভাবছিল পুলিশ। তার বাসা থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করল। পুলিশের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে চলেছে। হত্যার রহস্যের জট খুলছেই না। আসলে সার্জের হত্যার রহস্য জট না খোলার জন্য তিনি নিজেই দায়ী। এমন সব কাজ করে গেছেন, ফলে কে যে তাকে হত্যা করেছে তা কখনই পরিষ্কার নয়? সুষ্ঠু বিচার যদি কোনদিন না হয় সেটাও হবে এক ধরনের অনৈতিক বিচার।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বদমেজাজী দশ শিক্ষক

প্রতিটি পেশায় কিছু রহস্যময় মানুষ রয়েছে। আর প্রতিটি পেশায় মানুষ কিভাবে সাফল্য পায়, নিয়ম-কানুন সুন্দরভাবে পালন করে, সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু সব কিছুরই একটা ব্যতিক্রম থাকে। ব্যতিক্রম কোন উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত হতে পারে না বটে। এসব ব্যতিক্রমী ঘটনা যুগ যুগ ধরে আলোচনার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। সব স্কুল, কলেজে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ-তরুণী রয়েছে যারা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনার জন্ম দেয়। তারা সে ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করে। পুলিশের পর্যালোচনায় এমনকিছু প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষকের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পুলিশ বিভাগ এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষকদের আচার-ব্যবহারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এ পৃথিবীতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোথাও দস্যুবৃত্তির শিক্ষা দেয়ার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। সেটা থাকার কথাও নয়। অবশ্য কেউ যদি জেলে যান তাহলে সেখানে দেখতে পাবেন দস্যুদের কিভাবে রাখা হয়েছে। তাই বলে সেটা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। সেটা শাস্তির জায়গা। কিন্তু এ পৃথিবীতে সত্যিই দস্যুবৃত্তির স্কুল রয়েছে। তাদের কোন বই খাতা নেই। সে স্কুলের শিক্ষকরা যে অপরাধী জগতের হবে সেটাই স্বাভাবিক। তারা ছাত্রদের শিক্ষা দেয়, কিভাবে দস্যুবৃত্তি করতে হবে, পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে। সব কাজই সুচতুরভাবে সম্পন্ন করতে হবে। একথা সত্য, অপরাধী ও পুলিশ দুটো বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। অপরাধী সমাজে শুধু ক্ষতিই করে। পুলিশের কাজ অপরাধীকে শায়েস্তা করা। সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু একটি বিষয়ে দুটো গোষ্ঠীর মিল রয়েছে। উভয় পেশার মানুষ নিজস্ব কিছু নিয়ম মেনে চলে। পুলিশের কাজে পরিকল্পনা থাকে। কোন কাজের আগে অবশ্যই তার অতীত ইতিহাস জেনে নিতে হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে। কাজটি কোন ধরনের ও অপরাধী কোন শ্রেণীর সেটাও তাদের নখদর্পনে রাখতে হয়। এ রকম চিন্তাভাবনা করে কাজ করে সন্ত্রাসী এবং দস্যুরা। তারা যখন বড় ধরনের কোন অপারেশনে নামে তারা প্রথমে ভাবে কার বিরুদ্ধে, লড়ছে, তার ক্ষমতা কতটা বিস্তৃত সেটা ভেবেই প্রতিপক্ষকে আক্রমন হত্যা বা শেষ করে দেয়।

BanglaBook.org

পুলিশ এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মৌলিক শিক্ষা প্রায় একই রকম। পুলিশ যখন প্রশিক্ষণ নেয় তখন তাকে শেখানো হয় কিভাবে নিরাপদে থেকে শত্রুকে ঘায়েল করতে হয়। অস্ত্র ব্যবহার যত কম করা যায়, সে তত বুদ্ধিমান এবং কৌশলদীপ্ত পুলিশ। সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি অনেকটা সেরকম। প্রতিপক্ষকে হত্যা বা একেবারে শেষ না করে হুমকিতে কাজ হলে তারাও চায় না ধ্বংসযজ্ঞ রচনা করতে। দু'টি বিভাগকেই মৌলিক শিক্ষা দেয়া হয়, সব ধরনের নগদ টাকা পয়সা উপার্জন বৈধ। কোথা থেকে এসেছে তা চিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই। ডলারের ছড়াছড়ি হবে যে কোন কিছু পাওয়ার জন্য। যেমন মারিজুয়ানা, এটা কোন অপরাধের মধ্যে পড়ে না। আরো যেসব অপরাধ রয়েছে এগুলো একেবারে অবশ্য ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে না। আর যে কোন কাজের জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের শরণাপন্ন হতে হয়। এ মধ্যস্বত্বভোগীদের কাজ একটাই– সব ধরনের পণ্য তা বৈধ বা অবৈধ হোক তার মূল্য কমিয়ে বিক্রি করা। এর মধ্যে মুনাফার অংশ সে রেখে দেয়। তা যে পণ্য হোক, বন্ড বা টিভি সেট, সবই তারা মূল্য কমিয়ে বিক্রি করে। কিন্তু নিজের মুনাফার ব্যাপারে ছাড় দেয় না। যার কাছে পণ্যের প্রয়োজন রয়েছে মধ্যস্বত্বভোগী তেমন ক্রেতাই খোঁজে। যার কাছে ন্যায্যমূল্য পাওয়া যায় তার কাছেই পণ্য বিক্রি করে। ভোক্তাশ্রেণী অনেক সময় বাজারে বেশি ঘোরা-ফেরার পরিবর্তে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে পণ্য কিনে নেয়। তাতে তাদের লাভও হয়। এ ধরনের লেনদেনে কোন সমস্যা হয় না। আর বাকির কোন হিসাব নেই। সব ধরনের লিখিত চুক্তি বাতিল করে দেয়া। বাস্তবিক অর্থে কোন লিখিত চুক্তিই থাকে না।

অনেক সময় অপরাধী নিজেদের তৈরি আইন-কানুন ভঙ্গ করে। অধিকাংশই কখনোই পুলিশের কাছে ধরা পড়ে না। এমনকি প্রতিপক্ষ তাদের সহজে কিছু করতে পারে না। তারা খুবই বদমেজাজী, রগচটা এবং নিজেদের স্বার্থে আইন-কানুন তৈরি করে। তারা ডাকাতি করে, বড় বড় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নগদ টাকা সম্পদ লুট করে। তাদের চিন্তা-চেতনা, কৌশল ভিন্ন।

অপরাধী গোষ্ঠী যখন নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা করে তারা একটা নকশা তৈরি করে। আরো অনেক কিছুরই বর্ণনা করা যায়। তারা তাদের চিন্তা-চেতনা সহজেই বিস্তৃতি ঘটাতে পারে। সন্ত্রাসী গোষ্ঠী অনেক সময় জাদুঘর থেকে বিখ্যাত সব চিত্রকর্ম ডাকাতি করে। সেগুলো তরা সহেজেই বিদেশে পাচার করতে পারে। বড় ধরনের ক্যানভাস কখনো বহন করত না। তারা ছোটছোট ছবিগুলো ব্যাগে ভাঁজ করে নিয়ে যেত। তারপর মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে দিয়ে

BanglaBook.org

দিত। তারা সুবিধামত বিক্রি করে দিত। একথা সত্য, মূল্যবান এসব চিত্রকর্মের মূল্য ডাকাতদের কাছে অর্থহীন। তারা এর গুণগত মূল্য বোঝে না। তারা শুধু টাকাই চেনে। একজন চিত্রশিল্পী কত মেধা ও শ্রম খাটিয়ে এ কাজ করে তার মূল্য বা অবদান ডাকাতরা বুঝবে কেন?

১৯৩৩ সালে ব্রুকলিন জাদুঘরে দশটি পেইন্টিংস চুরি হয়। প্রতিটি ছবির উচ্চতা ২৪x১৮ ইঞ্চি। সেসব ছবির মধ্যে একটি ছিল পিটার পল রবেনসের আঁকা যীশুখ্রিস্টের ছবি। এ ছবির মূল্য সে সময় ৩০ লাখ ডলার। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা অর্থের বিনিময়ে এ ছবির মূল্য হতে পারে না। রাষ্ট্রের মূল্যবান সম্পদ এ ছবি।

ব্রুকলিন জাদুঘরে ডাকাতি সত্যিকার অর্থে দস্যুবৃত্তির নিখুঁত উদাহরণ। তারা এমনভাবে কাজটি করেছে, পুলিশ তা ধরতেই পারেনি। ডাকাতি কতটা নিখুঁত হতে পারে সেটাই যেন একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা দিল। এটা যেন খুবই সাধারণ ব্যাপার এমনভাবে ডাকাতি হয়েছে। আর অন্যদিকে পুলিশের কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী ব্যর্থ। পুলিশ কাউকেই সন্দেহের তালিকায় আনতে পারেনি। ফলে এ বিষয়ে, তদন্ত করবে সে সুযোগও নেই। এতকিছুর পর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেতো চলবে না। পুলিশকে ঠিকই অনুসন্ধান করতে হবে। তাদের প্রাথমিক চেষ্টা কোন সুফল বয়ে আনেনি। পুলিশ এটুকুন বুঝতে পেরেছে, কারো একার পক্ষে এ মহামূল্যবান তৈলচিত্র চুরি বা ডাকাতি করা সম্ভব নয়। এর পিছনে অনেকেই জড়িত। আন্তর্জাতিক অপরাধী গোষ্ঠীর জড়িত থাকাই স্বাভাবিক। কোন ব্যাপারেই নিশ্চিত হতে পারছে না পুলিশ। একবার ভাবছে অনেকেই জড়িত থাকতে পারে, এবং এর পিছনে বহু কারণ রয়েছে, আবার ভাবছে স্রেফ ডাকাতি অন্য কোন কারণ নেই।

প্রথম ক্লু হিসেবে কাজ করেছে, ব্রুকলিন জাদুঘর একেবারে নিচতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত চারপাশে কাঁচের দেয়াল দিয়ে আটকানো। জাদুঘরের জানালাগুলো ঠিকমত বন্ধ ছিল কি? সম্ভবত ডাকাতরা যেখানে যিশুখ্রিস্টের ছবি ছিল সে তলা থেকে দঁড়ি দিয়ে বেঁধে ছবিটা নামিয়েছে। তাহলে কি পরিমাণ বড় দঁড়ি তারা ব্যবহার করেছে? আর সে সময় নিচে কি কোন মানুষজন ছিল না? এমনকি জাদুঘরের নিরাপত্তাকর্মীরাও কি ঘুমাচ্ছিল? পথে মানুষজন হয়তো চলাফেরা করছিল। গাড়ি এবং মটর সাইকেলে অনেকেই চলা ফেরা করছিল।

BanglaBook.org

ঘটনাটি দেখেছে অনেকে। সাধারণ মানুষ ভেবেছে, জাদুঘরের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে হয়তো এসব মানুষ কাজ করছে। তাই তারাই চিত্রকর্মগুলো সরাচ্ছে। এর বেশি কিইবা ভাবতে পারে পথচলা মানুষগুলো। সেখানে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটছে তা কে জানবে?

সুন্দরমত ডাকাতি সম্পন্ন হল। কোথাও কোন টু শব্দ নেই। ১৯৩৩ সালের ৩০ এপ্রিল, রাত ৩টা জাদুঘর কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। নৈশ প্রহরী ফ্রাঙ্ক ওয়ালস নোটিশ ঝুলিয়ে দিলেন।

ওয়ালস জানালেন,

"যীশুখ্রিস্টের শিল্পকর্ম ডাকাতি হয়েছে।"

তিনি দেখতে পান চতুর্থ তলায় একটা বিশাল দঁড়ি ঝুলছে। দঁড়ি নিচ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তিনি তার সহকর্মীদের নিয়ে চতুর্থ তলায় গিয়ে গ্যালারিগুলো পরিদর্শন করলেন। তিনি দেখলেন, গ্যালারিতে চিত্রকর্মগুলো ঠিক মতই রয়েছে, নেই পিটার পল রবেনসের যীশুখ্রিস্টের তৈলচিত্র। তিনি দ্রুত একটা কাগজ নিয়ে ঘটনা লিখলেন। ভাবলেন সকালবেলা কতৃপক্ষকে জানাবেন।

ওয়ালসের প্রতিবেদন তার বস জাদুঘরের নির্বাহী কর্মকর্তা জোসেফ সিব্যাক কাছে পৌঁছে দেয়া হল। তার টেবিলে রেখে দেয়া হল ওয়ালসের প্রতিবেদন। দিনটি ছিল রোববার, সাপ্তাহিক ছুটি ফলে জোসেফ সিব্যাক অফিসে আসেননি। পরেরদিন সোমবার তিনি অফিসে এসেছিলেন। জোসেফ সিব্যাকের উপরস্থ কর্মকর্তা পরিচালক উইলিয়াম ফক্স রোববার দুপুর ২টায় জাদুঘরে এসেছিলেন। কিন্তু কেউই তাকে ঘটনা খুলে বলার চিন্তা করেনি। রহস্যময় দঁড়ির কথা কেউ তাকে জানায়নি। এমনকি যীশ খ্রিস্টের চিত্রকর্ম ডাকাতি হয়ে গেছে সেটাও জানায়নি।

রোববার দুপুর ৩টা পযন্ত ঘটনা কেউই জানেনা।

এ সময় পঞ্চম গ্যালারির অ্যাটেনডেন্ট চার্লস হ্যানসেন জানালেন,

"দেয়ালে ঝুলানো ১০টি ফ্রেমের বাঁধানো মূল্যবান ছবি পাওয়া যাচ্ছে না।"

কিভাবে হারিয়েছে তা ব্যাখ্যা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তিনি নিজেও জানেন না। তার মনে হচ্ছিল এবার বুঝি চাকরি গেল। শুধু তাই নয়, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করবে। এসব ভেবে মুষড়ে পড়েছিল চার্লস হ্যানসেন।

উইলিয়াম ফক্স চুরির কাহিনী জানতে পেরে চিন্তিত হলেন এবং অনেকেই চতুর্থ তলায় দঁড়ি পড়ে আছে তা স্মরণ করল। তারা বুঝতে পারল কিছু একটা

BanglaBook.org

ঘটেছিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক সময় পার গেছে। পুলিশ বিষয়টি জানতেই পারেনি।

প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা ভিনসেন্ট জে সুয়েনি বলেন,

"অনেক সময় পার হয়ে গেছে।"

তিনি বেশ রাগত স্বরেই বললেন,

"পুলিশ আগামীকাল সোমবারের আগে জানতে পারছে না। এতে করে রাষ্ট্রের বড় ধরনের ক্ষতি হল।"

পত্রিকায় লেখা হল :

"দড়ির ক্লু বের করতে দেরী হল
চিত্রকর্ম ডাকাতি হল।"

প্রধান তদন্ত কর্মকর্তার বক্তব্য হচ্ছে, এ দেরীর পরিণতি একটাই–

"বিচারকার্য হিমাগারে চলে গেল। কে বা কারা করেছে সেটাই জানা যাবে না কখনোই। গোপনই থেকে যাবে চিরকাল। মানুষের মনে সন্দেহ বাড়বে বৈকি।"

বাস্তবিক অর্থে তাই ঘটল। পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগ জাদুঘরের নিরাপত্তা কর্মীদের জেরা করতে থাকে। যেভাবে জেরা চলছিল তা গল্পগুজব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, এর মাঝেও ভিনসেন্ট জে সুয়েনি কিছু ছবি তুলে নিলেন। যেখানে দঁড়ি রাখা ছিল সেখানে কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায় কিনা তাও খোঁজার চেষ্টা করলেন। কোন ফায়দা হল না। কারো কাছ থেকে কোন তথ্য পেলেন না।

প্রত্যেকে বলল,

"কেউই কিছু দেখেনি। সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে চোখে পড়েনি।"

সবচেয়ে বড় কথা ডাকাতরা কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। জাদুঘরের নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে কোন প্রকার ধস্তাধস্তি হয়নি। কোন ঘাত প্রতিঘাত ঘটনা ঘটেনি।

পত্রিকায় আবারো শিরোনাম হল ঃ

"আন্তর্জাতিক দস্যু জাদুঘর লুট করেছে।"

তারা কি বিশেষ কোন দস্যু? সবার মনে এটাই প্রশ্ন। পুলিশ নির্দিষ্ট কোন কোন অপরাধী গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে পারছিল না। উপরন্তু পুলিশের বক্তব্য আরো জটিলতার সৃষ্টি করেছে,

BanglaBook.org

"চিত্রকর্ম চুরি এবং ডাকাতির সাথে একটি বিশেষ গোষ্ঠী জড়িত বটে। তারা সারা পৃথিবী থেকে মূল্যবান চিত্রকর্ম ডাকাতি করে খুব দ্রুত বাজারে বিক্রি করে।"

এ বক্তব্যে কোন কিছুই পরিষ্কার হয় না। চুরি বা ডাকাতি যারা করে তারাতো যেভাবেই হোক বাজারে বিক্রি করে দেবে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ভাবছিল এটা সে-ই অপরাধী গোষ্ঠী যারা ১৯২৭ সালে নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন জাদুঘর থেকে পাঁচটি দুর্লভ চিত্রকর্ম চুরি করেছিল। সে সময়ের ঘটনা আর ব্রুকলিন জাদুঘর থেকে চুরি যাওয়া শিল্পকর্মের মধ্যে কিছুটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কৌশলগত ভিন্নতা রয়েছে বটে কিন্তু কাজ একটাই-

"শিল্পকর্ম ডাকাতি।"

ডাকাতরা ফ্রেমের আশপাশ দিয়ে হাঁটেনি এবং ফ্রেম স্পর্শ করেনি। এর অন্যতম কারণ ফ্রেমগুলো হীরক খচিত। ফ্রেম স্পর্শ করলে আঙুল কেটে যেতে পারে। হীরক খচিত ফ্রেম থেকে চিত্রকর্ম বের করে আসতে রাসায়নিক কোন পদার্থ ব্যবহার করেছিল ডাকাত গোষ্ঠী। পুলিশ অন্তত সেটাই বিশ্বাস করে।

ভিনসেন্ট জে সুয়েনি একটা ব্যাপারে ডাকাত বাহিনীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল, তারা জাদুঘরের গ্যালারিতে রাখা অন্য ছবির প্রতি নজর দেয়নি। তারা যে পুরো জাদুঘরের সবকিছু লুট করে নেয়নি সেটাই বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। কঠিন সব বক্তব্য সত্ত্বেও পুলিশের অদক্ষতায় তিনি হতাশ। প্রচার মাধ্যমকে সুয়েনি আশ্বস্ত করে বলেন,

"শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা লে. টমাস ডুগাল এ ঘটনা তদন্ত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং দক্ষ কর্মকর্তা। আশা করি অতি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। অপরাধীকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে।"

সুয়েনি অবশ্য টমাস ডুগালকে অত্যন্ত সতর্ক করে দিয়েছিলেন। খুব বেশি আশাবাদী হতে নিষেধ করেছিলেন।

তিনি বলেন,

"বহু বছর ধরে শিল্পকর্ম চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। এগুলোর কোন সমাধান হচ্ছে না, ডাকাতরা অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান।"

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলেছিলেন,

"এটাই যথেষ্ট।"

BanglaBook.org

চিত্রশিল্পী পল রুবেনস কর্তৃক যীশুখৃষ্টের প্রতিকৃতি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শিল্পকর্ম চুরি ও ডাকাতিতে যারা পটু তারা অন্য আর কোন অপকর্মের সাথে নিজেকে মেলাতে পারে না। এ অপকর্মের সাথে প্রকৃতপক্ষে অনেক রাঘব বোয়াল জড়িত ছিল। ডাকাতি করার সময় নিম্নশ্রেণীর লোককে কব্জা করে। তাকে সামান্য অর্থ প্রদান করে। শিল্পকর্ম চুরি করে সে তাদের হাতে তুলে দেয়। যারা এ শিল্পকর্মটি হাতে পায় তারা তাদের নিজস্ব ম্যাগাজিনে ছবি ছাপিয়ে বিক্রি করে অর্থ আয় করে।

শিল্পকর্ম চুরির ক্ষেত্রে ফরাসী ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোক্তা গোষ্ঠী অত্যন্ত পটু। তারা বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরে গিয়ে মূল্যবান ছবি দেখে আসে তারপর নিজস্ব লোকবল দিয়ে তা হস্তগত করে। তারা এর নাম দিয়েছেন আন্তর্জাতিক চুরিকৃত চিত্রকর্ম। সব ধরনের ছবি তারা চুরি করে। ক্রীড়াপ্রিয় ব্যক্তিদের সেরা ছবি নিয়ে জাদুঘর বানিয়েছে তারা, ব্যক্তিগত সংগ্রহ মজুত করেছে। তাদের এসব কাজ যারা করে দেয় সেসব কর্মচারীকে ৫০ ডলার প্রদান করে। ব্রুকলিন কর্মকর্তারা ভাবছে এটা ফ্রান্সের চোরদের কাজ হতে পারে। কিন্তু কোন কিছুই নিশ্চিত নয়।

জাদুঘরের কিউরেটরকে জিজ্ঞাসা করা হল,

"কেন আপনারা একেবারে প্রথমেই চতুর্থ তলায় চলে গেলেন? সেখানে কিছু চিত্রকর্ম ডাকাতি হয়েছে এ ধারণা কেন হল? একেবারে নীচ তলা থেকে পরিদর্শন করা হল না কেন? আপনারা কি নিশ্চিত ছিলেন চতুর্থ তলায় ছবি চুরি হয়েছে?"

উত্তরটা কৌশলে দিল কিউরেটর।

সে বলল,

"আমরা দেখলাম চতুর্থ তলার জানালায় বিশাল দঁড়ি ঝুলছিল। তাই দ্রুত সেখানে নিরাপত্তারক্ষীকে পাঠালাম। সেখানে গিয়ে দেখা যায় ফ্রেমে ছবি নেই। দশটি ছবি চুরি হয়েছে। কিন্তু কিভাবে হয়েছে তা বুঝতে পারছি না। নিচে কাউকে দেখিনি।"

তার এ বক্তব্য প্রচার মাধ্যমের কেউই খুশি হতে পারেনি। এসব মেকি কথা জানা আছে পুলিশের। কার মাধ্যমে চুক্তি হয়েছিল সেটাই তারা বের করতে চাচ্ছিল। ছবিগুলো পাচার করে দিয়েছে। অর্থ ভাগবাটোয়ারা হয়েছে আগেই।

এর অর্থ দাঁড়ায়, জাদুঘরের কেউ না কেউ এ অপকর্মের সাথে জড়িত ছিল। পুলিশ প্রাথমিক যে ধারণা করছে, তা হচ্ছে সংঘবদ্ধ ডাকাত দল জাদুঘরে ঘুরতে এসেছিল শনিবার। তাদের সাথে চিত্রকর্ম সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে, ও এর মূল্য সম্পর্কে জানে তাকে নিয়ে এসেছিল। তারা পুরো দিন সেখানেই ঘোরাফেরা

BanglaBook.org

করে। তারপর রাতে সম্ভাব্য স্থানে লুকিয়ে থাকে। যাতে কেউই তাদের খোঁজ না পায়।

এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন,

"জাদুঘরে তিনজন অপরিচিত যুবক প্রবেশ করেছিল।"

তারা যে অপরিচিত এর প্রমাণ কি? যে দঁড়ি চতুর্থ তলা থেকে নিচে পর্যন্ত ঝুলে ছিল তা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ২০ ভাগে বিভক্ত। এক একজন এক এক অংশে কাজ করেছিল।

সবচেয়ে বড় রহস্য ও বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, কেন তারা এ দঁড়ি বেছে নিল। উপরস্থ কর্মকর্তার নির্দেশে তারা এ ছবিগুলো চুরি করেছিল। অপরাধীগোষ্ঠী বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের কাছে বিক্রি করবে বলে ছবি চুরি করেছিল। প্রচুর দামে বিক্রি করেছিল তারা। তাদের দাবীকৃত অর্থ নিয়ে ক্রেতাপক্ষ কোন প্রশ্ন তোলেনি।

ভিনসেন্ট জে সুয়েনির অভিমত হচ্ছে,

"যেহেতু ছবিগুলো বিদেশি চিত্রশিল্পী কর্তৃক তৈরি হয়েছে তাই যে দেশের চিত্রকর্ম তাদের দেশপ্রেমিক ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এ ছবিগুলো কিনে নিয়ে নিজের দেশে নিয়ে গিয়েছিল। তারা বীরের মত ছবি নিয়ে চলে গেছে।"

১৯১১ সালে ফ্রান্সে লুভ জাদুঘর থেকে মোনালিসার ছবি চুরি হয় তখন থেকে এ কর্মকাণ্ড জাতীয় গর্ব ও আত্মসম্মানের বিষয় হয়ে উঠে। মোনালিসার ছবি এঁকেছিলেন বিশ্বখ্যাত ইটালিয়ান চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি। তার ছবি চলে যায় ফ্রান্সের লুভ জাদুঘরে। ইটালিয়ানরা তা আবার চুরি করে নিজের দেশে নিয়ে যায়।

চোর যখন ধরা পড়ে তখন গর্ব করে বলে,

"এ বিশ্বখ্যাত ছবি এঁকেছেন আমার দেশের সেরা চিত্রশিল্পী। ফ্রান্সের কাছে এটা ছিল। আমি চুরি করে নিজের দেশেই নিয়ে এসেছি। এতে আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই। বরং দেশের জন্যই এ চুরি করেছি।"

নিউইয়র্ক পুলিশ তাদের দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিদর্শনের জন্য ব্রুকলিন থেকে ছবি চুরির জন্য বিদেশি কোন গোষ্ঠীকে দোষারোপ করে পার পেতে পারে। ১৯৩০ সালে বাকিংহ্যাম রাজপ্রাসাদ থেকে বেশ কিছু চিত্রকর্ম চুরি হয়েছিল। ইংল্যান্ডের পত্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রের দস্যুদের দোষারোপ করা হয়েছিল। এভাবেই প্রকৃত ঘটনা চাপা পড়ে যায়। কোন সমাধান হয়নি। ব্রুকলিন জাদুঘরে চুরি যাওয়া ছবি উদঘাটনে প্রতিনিয়ত জটিলতা সৃষ্টি হল। কিন্তু সমাধানের কোন পথ বের হয়নি। প্রচুর ধরপাকড় এবং তল্লাশী হল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই

BanglaBook.org

হলনা। পুলিশ যাদের সন্দেহ করেছিল তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কারণ এসব অপরাধীরা জাদুঘর থেকে ছবি চুরির ক্ষমতা রাখে না। চিত্রকর্ম চুরির সাথে জড়িতরা ওয়াল্টার স্কটের লেডি অব দ্যা লেক ছবিটি চুরি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। মরগান লাইব্রেরি থেকে চুরি হতে গিয়েছিল সে মূল্যবান ছবি। কিন্তু লাইব্রেরির নিরাপত্তা কর্মীদের অসম্ভব সাহস আর মানসিক দৃঢ়তার কারণে চোররা পিছু হটে।

ব্রুকলিনের ছবি চুরি যাওয়ার ব্যাপারে পুলিশ নড়েচড়ে বসে। তারা এক পর্যায়ে ছবি উদ্ধারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। জাদুঘরের ১২৫ জন কর্মকর্তা - কর্মচারীকে নানা রকম প্রশ্ন করে। তারা জেরা করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাদুঘরের কর্মকর্তাদের কাছে হারিয়ে যাওয়া ১০টি বিখ্যাত ছবির বর্ণনা পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারা জানিয়ে দেয় এরকম কোন ছবি পেলে তৎক্ষণাৎ তাদের যেন সংবাদ দেয়া হয়। সব বিমান, সমুদ্র ও স্থল বন্দরে কড়া পাহাড়া বসানো নিযুক্ত করা হয়। সর্বত্র নজর রাখা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা অর্জন করে পুলিশ। বিশেষ করে, কারো হাতে ছবি, ফ্রেম দেখতে পেলেই তাকে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করছে গোয়েন্দা বিভাগ। দঁড়ি হাতে দেখলে কথাই নেই। ফলে এ ধরনের বিড়ম্বনার শিকার কেইবা হতে চায়। সবাই বাঁচতে চায়। অনেকেই পালাতে থাকে। এমনও দেখা গেছে বিশেষ ধরনের কোন ক্রীড়াবীদ এবং প্রশিক্ষক দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। এতে করে নতুন বিপর্যয় দেখা দিল। সাধারণত চোররা চুরির সময় দঁড়ি ব্যবহার করে। সার্কাসেও দঁড়ি ব্যবহার হয়। ছবি চুরির পর সার্কাসে দঁড়ির প্রয়োগ যেন কমতে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য দঁড়ি বহনকারী কে ছিল তা প্রমাণ করা যায়নি। ক্যাপ্টেন জেমস প্রিচার্ড বলেন,

"চোররা দঁড়ি ব্যবহার করেছিল। জাদুঘরে একটার পর একটা তলায় উঠতে এবং নির্দিষ্ট চতুর্থ তলা পর্যন্ত তারা শক্ত দঁড়ি ব্যবহার করেছিল।"

রিং ব্যবসায়ী ব্রস এন্ড বার্নাস কোম্পানীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, দঁড়ি কি পরিমাণ রিং আকারে বাঁধা যায়?

তাদের একটাই উত্তর,

"৫০০ ফুট পর্যন্ত রিং করা সম্ভব।"

পর্যবেক্ষক লে. ডুগানের মতামতও এরকম।

ছবি চুরি যাওয়ার দু'সপ্তাহ পর পরিচালক উইলিয়াম ফক্স ঘোষণা করেন,

"চোরদের ধরতে পারলে দু'হাজার ডলার পুরস্কার প্রদান করবেন।"

তার এ প্রস্তাবে কোন সাড়া মেলেনি।

BanglaBook.org

এদিকে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এ ধরনের ঘটনা যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে কঠোর পন্থা অবলম্বন করল। সকল কর্মচারীকে নির্দেশ দেয়া হল তারা যেন সুন্দর ও পরিপাটি হয়ে কর্মস্থলে আসে। সম্ভাব্য সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। জাদুঘর যেন একেবারে সংরক্ষিত এলাকায় পরিণত হল।

এত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও তিনমাস পর পুনরায় দ্বিতীয়বারের মত ব্রুকলিনে ডাকাতি হতে গিয়েছিলো, এবার তা হতে পারেনি। চতুর্থ তলার পর্যবেক্ষক তা দেখে ফেলেন। তিনি অ্যালার্ম বাজিয়ে দেন। ফলে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়েছিল। ডাকাত পালিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ এ ঘটনা থেকে একটি বিষয় শিক্ষা নিল, এবার যে ডাকাতি করতে এসেছিল সে ২৫ বছরের যুবক এবং তার হাতে পিস্তল ছিল। তাহলে প্রথমবার যারা চুরি করতে এসেছিল তারা সবাই ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এটা নিশ্চিত হওয়া যায়। পুলিশ যৌক্তিকভাবে এ বিশ্বাস করতে পারে প্রথম ও দ্বিতীয় ডাকাত গোষ্ঠীর সাথে মিল রয়েছে। তারা একই গ্রুপের সদস্য। দ্বিতীয় ডাকাত গোষ্ঠী কি প্রকৃত অর্থেই প্রথম গোষ্ঠীর সদস্য? নাকি দ্বিতীয় ডাকাতরা এখনও পেশাদার হয়ে উঠেনি। তারা কি সৌখিন? চুরি ডাকাতিতে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছিল প্রথম ঘটনার ভিত্তিতে। উত্তরটা যাই হোক না কেন, ব্রুকলিন কর্তৃপক্ষের জন্য তা বিড়ম্বনা মাত্র।

দ্বিতীয়বার চিত্রকর্ম চুরির ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পর পুলিশ সবদোষ অপরাধ জগতের উপর চাপাল। এটা যেন প্রথাগত নিয়মে দাঁড়িয়েছে। কিছু ঘটলেই অপরাধ জগতের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে দায় মুক্ত করা আর কি! আরো একটি বিষয় সবার নজরে এসেছে। আবার চতুর্থ তলায় একজনকে দেখা গিয়েছিল। তিনি চুক্তি মোতাবেক সেখানেই ছিলেন। কোন কারণ ছাড়াই তিনি ছিলেন সেখানে এমনটি ভাবাও কষ্টকর। নিশ্চয়ই তার সাথে বড় ধরনের আর্থিক চুক্তি হয়েছিল। তার ফুট স্টেপস, হাঁটা, চলা সবই দেখতে পেয়েছিলেন নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী। তারা আর দেরী না করে পুলিশকে ফোন করেছিল। ফোন পেয়ে পুলিশও দেরি করেনি। একশত পুলিশ ঘিরে ফেলে পুরো জাদুঘর। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। কোন চোর-ডাকাত ধরতে পারেনি। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের আগ পর্যন্ত যতদিন সুয়েনি, ডুগান তারা গোয়েন্দা সংস্থায় ছিলেন ততদিন কোন বিপদ হয়নি। জাদুঘরে এরপর আরো একবার সমস্যা হয়েছিল। তিন তিনবার ডাকাতির ঘটনা পুলিশকে হতবাক করে তুলেছিল। তবে সাধারণ মানুষ বেশ বিরক্তবোধ করত এ ঘটনায়। এদিকে অপরাধ যেন বারবার ফিরে আসছিল। শূন্য ফ্রেমগুলো নিচে পড়ে ছিল।

BanglaBook.org

সেই শূন্য ফ্রেমে একই সাইজের আরো দশটি ছবি বাঁধিয়ে রাখা হল। দু'বছর পর পত্রিকায় পুণরায় লেখা হল।

পত্রিকা লিখল,

"ব্রুকলিনে ডাকাতির রহস্য আজও অনুদ্‌ঘাটিত।"

এ সময় ব্রুকলিনের পরিচালক ছিলেন ফিলিপ এন উজ। নতুন পরিচালক সবাইকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন,

"অতীতের ঘটনার প্রতি নজর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।"

তার সময় চারটি ছবি চুরি হয়েছিল। বাস্তবে এগুলো অত্যন্ত গোপনে স্টোররুমে রেখে দেয়া হয়েছিল। ফিলিপ সাংবাদিকদের সব সময়ই আমন্ত্রণ করতেন। তার সময়ে চারটি ছবি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা যতই তিনি লুকানোর চেষ্টা করেন মিডিয়া ততবারই তুলে ধরেছিল।

ফিলিপ একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। চুপ থাকার কারণে অনেক ষড়যন্ত্র গোপন থেকেছে। দু'বছর চুপ থাকার কারণ একটাই– ব্রুকলিন জাদুঘরে অনেক কর্মকর্তাই নিজস্ব স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বহু মজার ঘটনা ঘটেছিল। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ চিত্রকর্মগুলো ফিরে পেতে চেয়েছিল। দস্যুদের গ্রেফতার করতে চেয়েছিল পুলিশ। দস্যুরা পুলিশের প্রতি পাল্টা হুমকি না দিয়ে বরং চিত্রের প্রকৃত মালিকদের কাছে তা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা কি পুণরায় একে অপরের বিরুদ্ধে নতুন করে খেলা শুরু করেছিল! দস্যুরা কি সরাসরি কোন দাবী করেছিল? তারা কেন শতকরা চল্লিশ শতাংশ অর্থ দাবী করেছিল? উদ্ভট সব আইন কানুন বাদ দিয়ে তারা নিজেরাই নতুন সব নিয়মনীতি চালু করল। ডাকাতরা যে সব ছবি লুট করেছিল তা কখনোই পুলিশের কাছে প্রকাশ করতে চায়নি এবং করেওনি। সবচেয়ে বড় কথা তাদের কাছে একেবারে সব সময়ের জন্য ক্রেতা প্রস্তুত ছিল। ফিলিপ এন উজ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দিয়েছিলেন,

"তৃতীয়বার যখন ব্রুকলিনে ডাকাতি হল তখন চারটি মূল্যবান চিত্রকর্ম ডাকাতি হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা প্রমাণ সাপেক্ষে সেগুলো ফেরত পাওয়া গেছে। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ অনেক খোঁজাখুঁজির পরে তা খুঁজে পেলেও তারা অভিযোগ করল ছয়টি মূল্যবান ছবি পাওয়া যায়নি। দস্যুরা জানত ছবিগুলো খুবই মূল্যবান। তারা জানত ঐ ছয়টির মধ্যে তিনটি ছবি বৃদ্ধ শিক্ষকের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। চিত্রশিল্পী বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত নয় কেমন করে এসব ছবি পাচার হয়েছে।"

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

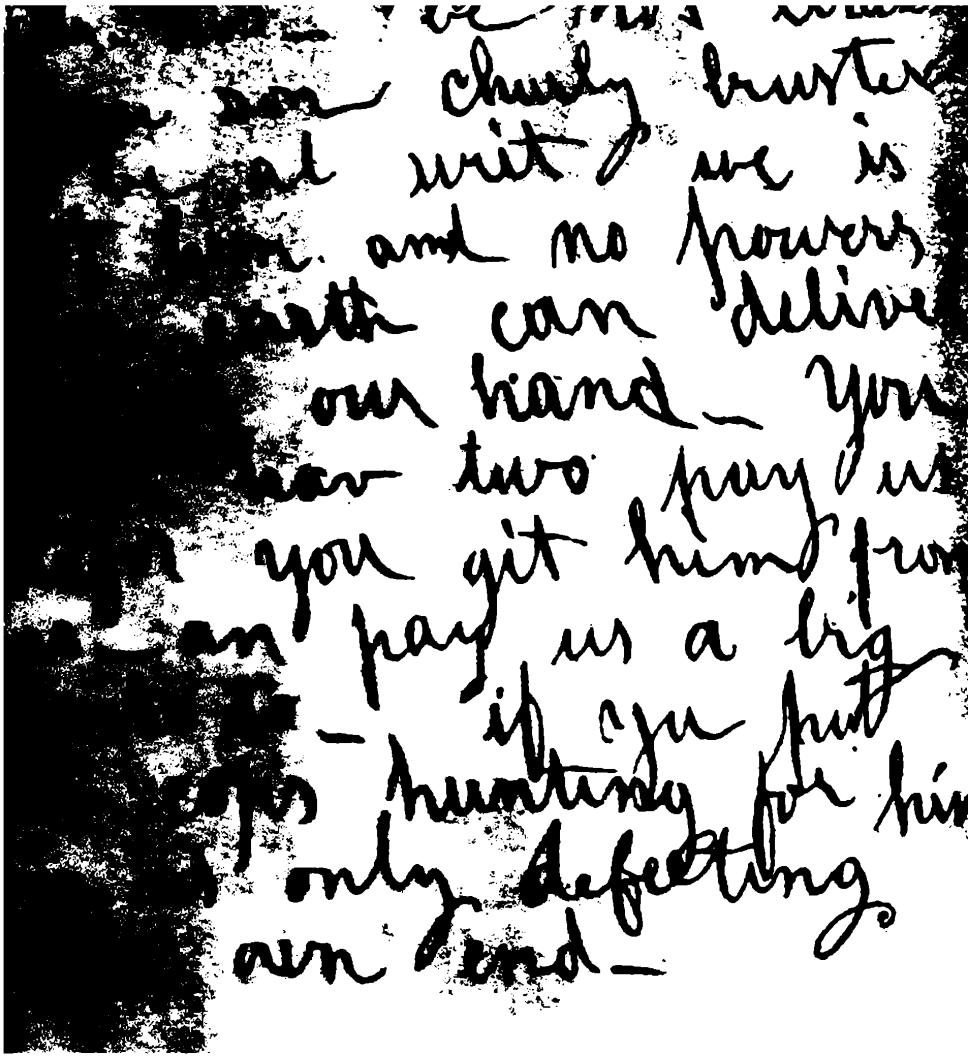
chuly bruste
wit we is
and no powers
can delive
our hand — you
two pay us
you git him fro
pay us a big
— if you put
hunting for hi
only defeating
an end —

অপহরণকারীরা মি. রসকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়। চিঠির ভাষা ছিল ভুলে ভরা

পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ যেখানে ব্যর্থ সেখানে তারা জানবে কি করে। যে চারটি ছবি পুলিশ উদ্ধার করতে পেরেছে সেগুলো তেমন মূল্যবান নয়। এসব ছবির খুব বিশেষ গুরুত্ব নেই জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কাছেও। রাখতে হয় তাই যেন রাখা।

ফিলিপ এন উজ বলেছিলেন,

"চারটি ছবি অবমুক্ত করা হল।"

বাকি ছয়টি ছবি প্রতিটি ৩৮ হাজার ডলারে বিক্রি করা হল। এ ছবিগুলো কিনেছিল মূলত দস্যুরাই। জাদুঘরকে নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশকে তারা যেন না জানায়। সব কাজ গোপনে সংঘটিত হল।

জাদুঘর কর্তৃপক্ষ পুলিশকে ঠিকই জানিয়েছিল। তারা গোপনে সংবাদ দিয়েছিল। তারা গ্যাংদের নির্দেশনামা ঠিকই জানিয়ে দিল। তারা পুলিশকে জানায়, ডাকাতদের কাছে অবৈধভাবে ছবি বিক্রি করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগে জাদুঘর কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের ঘটনাটি জানিয়ে দিয়েছিল। অবৈধ ব্যবসায়ীদের কাছে সাংবাদিকরা তা প্রচার করে। এভাবেই সর্বত্র প্রচার হয়।

গ্যাংরা দ্বিতীয় যে নির্দেশটি দিয়েছিল তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা সেভাবেই কাজ করতে বলেছিল জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে। তারা পেনসালভেনিয়া স্টেশন থেকে একটি চাবি এবং লকারের ব্যবস্থা করতে বলেছিল। লকারটি হতে হবে চারটি পেইন্টিংসের সমন্বয়ে। পেইন্টিংসের কর্মকাণ্ডে যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহলে তারা ৩৮ হাজার ডলারের বিনিময়ে যে ছবি কিনেছিল তা সে লকারে রাখা হবে এবং আইআরটি সাবওয়ে ৪২তম সড়কে পৌঁছে দিতে হবে। চাবি হাতে নিলেন ফিলিপ এন উজ। তারপর মালপত্র পাঠিয়ে দিলেন পেনসালভেনিয়াতে। সেখানে যার কাছে পাঠানোর কথা তিনি সময়মতই উপস্থিত ছিলেন। তিনিও দস্যুবৃত্তির সাথে জড়িত। তিনি লকার খুললেন, বের করলেন ক্যানভাস আকৃতির বিশাল ছবিগুলো। প্রতিশ্রুতিমত চারটি ছবি পেলেন তিনি। অনেকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, সেটা দেখা বা ভাবার সময় নেই তার। যখন স্টেশন ছেড়ে মালপত্র নিয়ে প্রধান সড়কে চলে এলেন তখন সন্দেহ করার মত কাউকে দেখতে পাননি তিনি। এমনকি কোন পুলিশও নেই।

সবকিছুই ভাল মত সম্পাদিত হল। যেভাবে পরবর্তী নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সেভাবেই পালিত হয়েছিল। উজ সেভাবেই এগুচ্ছিল। দু'টি ঘটনার বিবরণ দেননি তিনি। যে বান্ডলটি সে লকার স্টেশনে নিয়ে এসেছিল তা ছিল

BanglaBook.org

ডামি। সে মুহূর্তে এটার প্রতি কেউ একজন দৃষ্টি দিয়েছিল। লকারের উপর টর্চের আলো ফেলেছিল। এসব কিছুই পুলিশ লক্ষ্য করেনি।

মূলত লকারে যে বান্ডল রাখা হয়েছে তা একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। পত্রিকা স্টেশনের চারপাশে পুলিশ থাকলেও তারা যেন কিছুই দেখতে পায়নি। ডাকাতরা সম্ভবত জানত না, লকারে বা বান্ডলে যা ছিল তা ছবি ও চিত্রকর্মের ডামি। প্রকৃত ছবি নেই। উজ আগেই তা সরিয়েছিল। ডাকাত গোষ্ঠী যখন লকারের কাছে এসে ভেতরে কি আছে তা দেখতে চেষ্টা করল ততক্ষণে অনেক দেরী হয়েগিয়েছিল। মূল সমস্যা দেখা দিল কেউই বান্ডলের কাছে ঘেঁষছিল না। তারা খেয়াল করেনি এর মধ্যে কি ছিল? এর ফলে ফিলিপ এন উজ কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ল।

গ্যাং লীডাররা বান্ডলের ব্যাপারে একেবারে চুপ ছিল তার কারণ একটাই– তারা জানত এটা কার মাধ্যমে এসেছিল এবং কে এর মালিক। চিত্রকর্ম চোর বা ডাকাতরা এ বান্ডল লকারের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তারা এ ব্যাপারে সতর্ক ছিল। চোর বা ডাকাতদের কাজই হচ্ছে যেকোন জিনিসের সেরাটাই লুট করা। আর সে কারণেই সেরা চিত্রকর্মই লুট করেছিল ফিলিপ এন উজ। মুনাফা সে একাই ভোগ করতে চেয়েছিল। ছবি লুট করে তা থেকে মুনাফা লুট করে নেয়ার চিন্তা থাকলেও বাস্তবে লুট করা অর্থ তার পকেটস্থ সম্ভব করা সম্ভব হয়নি। বরং এমনও প্রমাণ আছে, যারা শ্রেষ্ঠ কর্ম চুরি করে, তারা এটা একেবারে বিক্রি না করে বরং বিভিন্ন জাদুঘরে সাময়িক প্রদর্শনি করে মুনাফা লুটে নেয়। সংঘবদ্ধ দল কেন ছবি চুরি করে? এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু এটুকুই বলা যায়, তারা জানে ছবিটি অনেক মূল্যবান। তারা এজন্য ছবি চুরির আগে বিশেষজ্ঞদের কাছ মতামত নেয়। তারপর ছবি চুরি করে, তা বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা লুটে নেয়। ছবি চুরি একটা ব্যবসায় পর্যায়ে চলে যায়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বানরের নাকাকৃত মানুষ

ভ্যান ব্রান্টের বিশাল বাড়ি। বলতে গেলে সেখানে তিনি একাই থাকেন। চারিদিকে সুনসান নিরবতা। তার বাড়ির সামনে অপরিচিত কেউ এসে দাঁড়ালেই ঘণ্টা বেজে উঠত। হঠাৎ করে একটা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হন তিনি। ভ্যান ব্রন্ট রাতে ঘুমানোর সময় ঘুমের ট্যাবলেট সেবন করেন। তার প্যান্টের পকেটে সব সময় ঘুমের ট্যাবলেট থাকত। ভ্যান ব্রান্টের বুদ্ধিতে এটা কুলায় না, এটা কোন ধরনের অপহরণের ঘটনা। তিনি একটি বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছালেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম অপহরণ অপরাধীদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। কিন্তু এটাও শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধ জগতের কথা সম্পর্কে কিছু জানতেন ভ্যান ব্রান্ট । সেটার প্রতিও তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করতেন না তিনি। অনেক বিষয় ভাবতেন তিনি। নিজেও অবাক হতেন। সে ভাবনাগুলো একেবারেই ক্ষণিকের। তারপর হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। তার ভাইয়ের বাড়িটা ছিল আরো রহস্যময়। অপরিচিত কোন ব্যক্তি সে বাসায় প্রবেশ করলেই, ঘণ্টা বেজে উঠত। মাঝে মধ্যে ভ্যান ব্রান্ট বেড়াতে যেতেন। তার ভাইয়ের বিশাল বাগানবাড়ীতে থাকত ছেলে, এবং বাগানের মালি। আর কিছু পরিচিত ব্যক্তি। এদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না শুধু, একটুকু বলা যায়, তিনি এদেরকে কারো কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সবকিছুই রহস্যময়। বাড়ির কলিং বেল বাজাতে গেলে, কেউ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হতে পারে। আর এ কারণে ভ্যান ব্র্যান্ট আগে থেকেই সতর্কাবস্থা অবলম্বন করতেন। নিজের নিরাপত্তার জন্য ভ্যান ব্র্যান্ট সব সময় হাতে শটগান এবং পিস্তল রাখতেন। ভাবতে অবাক লাগে এত নিরাপত্তার মধ্যে থেকেও তিনি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তার নিরাপত্তা বাহিনীর চার সদস্য গভীর রাতে প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে সশস্ত্র অবস্থায় বিশেষ অভিযানে নামল। বাড়ির সামনে আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখল তারা। জানালা দিয়ে দেখতে পেল ঘরে কেউ নেই, কিন্তু দুটো বাতি নড়ছে। এটা কি ঝড়ো হাওয়ার কারণে কিনা তা বোঝা গেল না? ভ্যান ব্র্যান্ট উপলব্ধি করলেন এর মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হল। অদেখা শত্রুকে শেষ করতে প্রস্তুত হল। অ্যাম্বুশ করার চেষ্টা করল। শত্রুরা ঘরের মালপত্র লুট করার চেষ্টা করছিল, তাই ভাবছিলেন ভ্যান ব্র্যান্ট। কিন্তু শত্রুরা কোথায়?

BanglaBook.org

ভ্যান ব্র্যান্ট ও তার দলের সদস্যরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করতে ভয় পাচ্ছিল। হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায়। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল তাদের। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর তুষারপাতে জমে যাচ্ছিল তারা। সময় পার হচ্ছে, ভ্যান ব্র্যান্টের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল কিন্তু কিছুই করার ছিলনা। তারা সিদ্ধান্ত নিল ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবে। তারা যেন অপরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেল। কুপির আলো নিভে গেল এসময়। পুরো মাত্রায় ভয়ার্ত পরিবেশ তৈরী হল। সে অন্ধকারেই কে একজন দৌড় দিল বলে মনে হল। কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারেই ঘরের মধ্যে চলল গোলাগুলি। ভ্যান ব্র্যান্ট এবং তার সতীর্থরাও গুলি করল। এক নাগাড়ে গুলি চলছিল। যেন যুদ্ধক্ষেত্র। শত্রুপক্ষ পরাস্ত হলে গোলাগুলি বন্ধ হল। প্রচণ্ড মাত্রায় গুলিবর্ষণ হল। একজন নিহত হল। আরেকজনের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। গুরুতর আহত হল সে। শরীরের বহুস্থানে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, রক্তক্ষরণ হয়েছিল প্রচুর। এ অন্ধকারে এলোপাথারি গুলিতে বর্ষনে কার গুলি দস্যুদের গায়ে লেগেছে তা বলাও মুশকিল।

ভ্যান ব্র্যান্টের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি জানতে পারলেন, ডাকাত দলের মধ্যে যে গুরুতর আহত হয়েছে সে ছিল জো ডগলাস। আর তার সহযাত্রী যে মারা গেছে সে ছিল বিন মোসের। তারাই ছোট্ট ছেলে শার্লি ব্রেস্টারকে অপহরণ করেছিল। দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে ছোট্ট ছেলেটি তাদের কিছু বলার আগেই মারা গেল। তাকে হত্যা করা হল। প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল সে।

১ জুলাই ১৮৭৪, অপহরণের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এর কোন সুরাহা করতে পারেনি পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ। একথা সবাই জানত, এ অপকর্মটি যারা করেছিল তারা প্রত্যেকেই দাগী আসামী। ছোট্ট শার্লি ব্রেস্টার রসের অপহরণ কাহিনী, কেউ জানত না তা নয়। অনেকেই এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল। কিন্তু পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের জটিলতা, এবং তাদের আচরণ এতটাই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল, কারো পক্ষে এ নিয়ে কথা বলার কোন আগ্রহ ছিল না। এতকিছুর পরও একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী কখনোই এ দুর্ঘটনার কথা ভুলতে পারবে না। সে হচ্ছে ব্রেস্টার রসের ছোট ভাই ওয়াল্টার। তখন তার বয়স মাত্র ছয় বছর। অপহরণকারী বিন মোশেরকে চিনতে পেরেছিল সে। বিন মোশেরকে বানরের নাকাকৃত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল ওয়াল্টার। প্রকৃত অর্থে সে রকমই দেখতে ছিল বিন মোশের। নাকটি ছিল হুবহু বানরের মত। অপরহনের দিন বাসায় ছিল ওয়ান্টার আর রস। ছোট ভাই ওয়াল্টারকে নিয়ে জো ডগলাস মোমবাতি বাতি কিনতে গেল। মূলত তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়াই ছিল মোশের মূল উদ্দেশ্য। তারা যখন বের হল এর কয়েক সেকেণ্ড পরই বিন মোশ

BanglaBook.org

তার উদ্দেশ্য সফল করল। অপহরণ করল শার্লি রসকে। তাকে গুম করে ফেলল। পুরো ঘটনাটি ছিল নাটকীয়। বাইরে থেকে কেউ কিছুই বুঝতে পারেনি। শার্লি রসের আকুতি মিনতি বিন মোশের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। এরপর কত খোঁজাখুঁজি, কত চেষ্টা কিন্তু সব কিছুই ব্যর্থ হল। বিচারকার্য শুরু হয়েছিল। আজীবন একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, বিচারক এবং জুরি বোর্ড ঠিকই বুঝতে পেরেছিল বিন মোশের এবং জো ডগলাস অপরাধী কিন্তু তাদের কার্যক্রম ছিল পুরোপুরি রহস্যময়। এক পর্যায়ে তা স্থিমিত হয়ে গেল। তারা একেক সময় এমন এক একটা বিষয় উত্থাপন করত যা বাস্তব ঘটনার সাথেই কখনো কোন মিল ছিলনা। বহু বছর পর আদালতে আবারও যখন মামলা উঠল তাতে আরো জটিলতা বাড়ল বৈকি। এবার কিভাবে মামলা পরিচালনা করবে তা নিয়েই গলদঘর্ম হল বিচারক। কারণ আসামী দু'জনেই মারা গেছে। ফলে শার্লি রসের অপহরণ রহস্যের জট খুলল না। তাকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না।

শার্লি রসের অপহরণ ঘটনা একেবারে শুরু থেকেই মর্মান্তিক এবং হৃদয়বিদারক। সেরা গোয়েন্দারা শুরুতেই ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল। তাদের কর্মকাণ্ড মানুষকে সন্দিহান করে তুলেছিল। সবচেয়ে বড় কথা এবং দুঃখজনক ঘটনা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অপরাধী গোষ্ঠী কেউই অতীতে এ ধরনের অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল না এবং উভয়পক্ষের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাহলে প্রশ্ন উঠে কে এ অপরাধী? কিভাবে ঘটল এ অপহরণের ঘটনা? এ ঘটনার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রে কখনো শিশু অপহরণ হতে পারে তা ভাবাই যায়নি। বড় ধরনের অপরাধ সংঘটিত হলেও নাবালক শিশু অপহরণ হবে আর তার কোন হদিস পাওয়া যাবে না তা কেউ চিন্তাও করেনি।

১৮৮০-তে যুক্তরাষ্ট্রে যে সব অপরাধ সংঘটিত হত সেসবের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত ছিল ধর্ম নিয়ে লড়াই। অপরাধীর মধ্যে একটা নীতিবোধ কাজ করত। এটা ঠিক অপরাধী সবকিছুর বিনিময়ে মুনাফার হিসাব কষত। কিন্তু কোন অপরাধী শিশু অপহরণের চিন্তাই করত না। প্রকৃত অর্থেই যুক্তরাষ্ট্রে এটা ছিল নতুন ঘটনা মাত্র। নতুন দিকে মোড় নিল অপরাধ জগত।

শিশুদের ভয় দেখানোর জন্য, বাবা-মা রুপকথার গল্প শোনাত। তারা জিপসি সর্দারের কাহিনী শুনত। জিপসি সর্দার এবং উপজাতি গোষ্ঠী শিশুদের চুরি করে নিয়ে যেত। তবে সেসব শিশুর ছিল অধিকাংশ বস্তি এলাকার। তারা কোন গন্য-মান্য ব্যক্তির সন্তান নয়। অর্থ-বিত্ত ও সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের শিশুরা অপহৃত হত না। এমনকি তাদের নিয়ে উপহাস করার মত বানানো কাহিনী তৈরী হত না। সে-ই যুক্তরাষ্ট্রেই এরকম অপহরণের ঘটনা ঘটল যা সবাইকে ভাবিয়ে তুলল।

BanglaBook.org

অপহৃত ছোট শিশু শার্লি রস

শার্লি রস ছোট্ট শিশু হলেও তার মেধা ছিল প্রখর। উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ফিলাডেলফিয়ায় ঐতিহ্যবাহী পরিবারে তার জন্ম। সোনার চামচ মুখে নিয়েই জন্মেছিল সে। তার বাবা ক্রিশ্চিয়ান কে রস সনামধন্য ব্যবসায়ী। তিনি ফিলাডেলফিয়ায় সম্মানিত পরিবারের সদস্য। ক্রিশ্চিয়ান রসের আর্থিক এবং সামাজিক সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এটা তার জন্য একদিকে যেমন সম্মান এবং গৌরবের ছিল তেমনি পরোক্ষভাবে তার শত্রু তৈরী হল। তিনি ভাবতেই পারেননি এ অর্থ, ধন, সম্পত্তি, বিত্ত, বৈভব তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কে তার শত্রু হতে পারে? এটা কারো জানা নেই। এমনকি ক্রিশ্চিয়ান রস নিজেও জানতেন না, তার কোন শত্রু আছে। তা ভাবার কথাও নয়। প্রতিপক্ষ ভাবত রসের সমতুল্য কেউই নেই। তার গতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু একটি দুর্ঘটনাই সব বদলে দিল।

অপহরণকারীরা শার্লি রসের প্রতি নির্দয়, নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল। তারা বাসা থেকে শুধু তাকে তুলে নিয়েই যায়নি, টাকা পয়সা লুট করেছিল। টানা তিনদিন শার্লি রসকে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রাখল। শার্লি রস যখন কান্নাকাটি শুরু করল তখন অপহরণকারীদের মনে হল এ শিশুটি যে কোন সময় পালিয়ে যেতে পারে। তারা বাচ্চাটিকে শান্ত করার জন্য অনেক কিছু এনে দিল। এর মধ্যে কৃত্রিম চুলের গুচ্ছ, বিশেষ ধরনের পুতুল ছিল। তাতে চোখ দুটো বাদামী, মুখটা গোলগাল, ধূসর রঙের স্যুট পরা পুতুল। জুতোটা লাল এবং মাথায় একটি টুপি রয়েছে। তাতেও শার্লি রসের মন গলল না। সে তার বাবা এবং ভাইয়ের জন্য কাঁদছিল। পুলিশের ধারণা ছিল শার্লি রসের অপহরণ কোন ছেলেখেলা ব্যাপার। তাই তাদের কাজের অগ্রগতিও ছিল খুব ধীরগতি। এর ফলে অপহরণকারীদের কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। পুলিশ জানত দু'ট মানুষ শার্লির রসের ভাই ওয়াল্টারকে মোমবাতি কেনার জন্য বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর শার্লিকে তারা নিয়ে যায়। ওয়াল্টার থেকে কয়েক হাত দূরে শার্লিকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে চলে যায় অপহরণকারীরা। এসব কিছু নিরবে দেখেছিল ওয়াল্টার। এরপর সে যখন মোমবাতি কিনে ঘরে ফেরে তখন সে দু'জন এবং তার ভাই ততক্ষণে চলে গেছে। পুরো বাড়ি তল্লাশী করে খুঁজল, কোন সন্ধান পেল না সে। কাঁদতে শুরু করল ওয়াল্টার।

রাস্তায় প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করল,

"তার ভাইকে দেখেছে কিনা?"

পথযাত্রীরা তাকে কাঁদতে দেখল। একজন তাকে বাসায় নিয়ে এল। এদিকে শার্লি রসের বাবা ক্রিশ্চিয়ান রস প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ খবর করতে

BanglaBook.org

থাকেন। তার নিখোঁজ সন্তানকে ফিরে পাওয়া যায় কিনা সেজন্য সবদিকে খোঁজ লাগালেন। পাগল হয়ে গেল সে।

পুলিশের ভাষ্য মতে, দু'জন মানুষ জুলাইয়ের প্রথম দিকে বাচ্চাটিকে অপহরণ করেছিল। তারা অ্যালকোহল মিশিয়ে জোড় করে তা পান করায় বাচ্চাটিকে। সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। পুলিশ অবশ্য ক্রিশ্চিয়ান রসকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেছিল।

তারা আশ্বাস দিয়েছিল,

"যেভাবেই হোক শার্লি রসকে খুঁজে বের করবে তারা"।

নিজেদের ব্যর্থতার জন্য লজ্জা পেল পুলিশ। শার্লি রস অপহরণের পরের দিন অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটল। অপহরণকারীদের একজন মদ্যপ অবস্থায় ক্রিশ্চিয়ান রসের কাছে এল। সে খুব উচুস্তরের কথা বলল। তার ভাবখানা এমন, সে খুব লজ্জা পেয়েছে এবং শার্লি রসকে ফিরিয়ে আনবে। স্থানীয় জনসাধারণ তাকে চাপ দিল। পুলিশ এ ঘটনা জানার পর ক্রিশ্চিয়ান রসকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করল। তারা ভেবেছিল সমাধান হয়ে গেছে। অপহরণকারীরা নিশ্চয়ই অর্থের প্রস্তাব দিয়েছে, আর সে অনুযায়ী ক্রিশ্চিয়ান রস তাদের দাবী মিটিয়ে দিচ্ছে বলেই শার্লি রসকে ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু এসবই ছিল ভুল ধারণা। এদিকে ক্রিশ্চিয়ান রস যখন ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু চিন্তা ভাবনা করছিল, সে সময় জার্মানীর ডাক্তার ওয়াকার নিশ্চিত করেন, ওয়াল্টার রস যে দু'জন মানুষের কথা বলেছিল তারাই অপহরণ করেছিল শার্লি রসকে। অনেকেই তার কথার কোন গুরুত্ব দিচ্ছিল না।

ডাক্তার ওয়াকার বলেন,

"রসের বাড়ির সামনে দু'জন মানুষ ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামল। হয়তো কোন আত্মীয় স্বজন হবে এ ভেবে তিনি আর সেদিকে দৃষ্টি দেননি। তবে তিনি এটা লক্ষ্য করেছিলেন তাদের মধ্যে একজনের চেহারার আকৃতি ছিল খুবই বিদ্‌ঘুটে। বিশেষ করে নাকটা ছিল একেবারে বানরের মত।"

এ কথাটিও বলেছিল ওয়ালটার। তার কথার কোন গুরুত্ব দেয়নি পুলিশ। তারা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

বরং কৌতুক করে বলেছিল,

"ছোট ছেলে সব কিছু খেলার ছলে বলেছে।"

কিন্তু ডাক্তার ওয়াকার যখন একই কথা বলেন, তখন আর হাল্কাভাবে নিতে পারল না পুলিশ। তা সম্ভব নয়।

ওয়াকারের তথ্যানুযায়ী এটা বুঝা গেল ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে ঐ দু ব্যক্তি রসের বাড়িতে প্রবেশ করেছিল। পুলিশও প্রাথমিকভাবে সেটাই সন্দেহ

BanglaBook.org

করেছিল। যদিও তারা এটা ভাবেনি, আসলে ঐ দু'ব্যক্তিই অপহরণকারী। তারাই শার্লি রসকে অপহরণ করতে এসেছিল। বরং তারা ভেবেছিল ক্রিশ্চিয়ান রসের কোন শত্রু হতে পারে, ক্রিশ্চিয়ানকে হুমকি দিতে শত্রুপক্ষের কেউ তাদের পাঠিয়ে ছিল । কিন্তু একেবারে বিপরীত ঘটনা ঘটল ক্রিশ্চিয়ান রস নিজেও ভেবে পাচ্ছিলেন না কে তার সন্তানকে অপহরণ করতে পারে? কি কারণে তার সন্তানকে অপহরণ করবে? শার্লি রসের মত নাবালক শিশুর তো কোন শত্রু থাকতে পারে না।

৪ জুলাই ১৮৭৪, ক্রিশ্চিয়ান রসের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐ দিন অপহরণকারীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবী বাবদ চিঠি পেলেন তিনি। কোন ডাক মাশুলের মাধ্যমে নয়, বরং অপরাধী গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে এ চিঠি পৌঁছে দিল তার হাতে। অপরাধ জগতে নতুন যুগের সূচনা হল। রস এবং পুলিশ সে-ই লোমহর্ষক চিঠি পড়ল। কিন্তু চিঠির লেখা তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভাষা এত দুর্বল হতে পারে তা কারো বিশ্বাস হচ্ছিল না। চিঠিটি ছিল ঃ

"আজ ৩ জুলাই। মিস্টার রস, আপনি আপনার ছেলের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। আপনার ছেলে শার্লি রস সুস্থ আছে। আমরা তাকে সযত্নে রেখেছি। এ পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, আমাদের কাছ থেকে কেউ আপনার ছেলেকে নিতে পারবে। ফলে আমাদের দাবি মিটিয়ে দিন। দাবি মিটিয়ে দিলেই আপনার ছেলেকে ফেরত দেব। যদি পুলিশকে জানান তাহলেই বিপদ হবে। পুলিশ আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা যেখানে তাকে লুকিয়ে রেখেছি তাতে কারো সাধ্য নেই যে উদ্ধার করতে পারে। অন্য কোন চিন্তা মাথায় এনে সন্তানের বিপদ ডেকে আনবেন না, যদি আপনি মনে করেন গোয়েন্দারা সাহায্য করবে সেটাও হবে মস্ত বড় ভুল।"

চিঠি দেখে হতভম্ব হল ক্রিশ্চিয়ান রস। সব কিছু যেন এলমেলো হয়ে উঠল। তার কাছে শুধু মনে হচ্ছিল অপরাধ জগতে নতুন যুগের সূচনা হল। পৃথিবীর সব বাবার মতই ক্রিশ্চিয়ান রস সন্তানের জীবন নিয়ে শংকিত হয়ে পড়ল, আর সেটাই স্বাভাবিক। তিনি যেকোন মূল্যে সন্তানকে ফেরত চান। ক্রিশ্চিয়ান রসের একটাই চিন্তা, অপহরণকারীরা যেন তার সন্তানের কোন ক্ষতি না করে। অপহরণকারীরা মুক্তিপণ বাবদ যে টাকা দাবী করেছিল তা দিতে সম্মত ছিলেন তিনি। পুলিশ বিষয়টি অন্যভাবে নিল। তাদের ধারনা অপহরণকারীরা এ চিঠির মাধ্যমে প্রচ্ছন্ন হুমকি জানিয়ে দিল। এটা যে শার্লির বাবাকেই দেয়া হল তা নয়, বরং একই সাথে ধন সম্পত্তির মালিকদের জন্য এটা হুমকি স্বরূপ। ধনীর দুলালরা যে কোন মুহূর্তে অপহৃত হতে পারে। এটা যেন তারই ইঙ্গিত বহন করে।

BanglaBook.org

ART THIEVES RAID BROOKLYN MUSEUM

Ten Old Masters, Eight From Friedsam Collection, Taken During Week-End.

WORLD ALARM IS SENT OUT

Dangling Rope Is Left by the Invaders—Fingerprints of Two Found on Window.

A daring week-end theft of paintings from the Brooklyn Museum was revealed yesterday by Dr. William H. Fox, director of that institution, who asked the police to broadcast an international alarm for the thieves and their loot.

Ten paintings, eight of them from the valuable collection of the late Colonel Michael Friedsam, were taken from the fifth floor galleries. They were valued at about $35,000 and were not insured.

A sixty-foot length of rope, knotted fast to a newel post on the fourth floor of the building at the Washington Avenue end and extending to the ground, gave a hint of the manner in which the thieves escaped. Fingerprints on the window sill indicated that two men committed the crime, the most sensational of its kind in years.

The stolen pictures included examples of the work of such noted early French painters as François Clouet, who is said to have modeled the death masks of Francis I and Henry II, and of Jean Fouquet, who is considered by connoisseurs the most representative of the fifteenth century painters.

নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি

পুলিশের চিন্তা ভাবনা ভিন্ন। তাদের কথা হচ্ছে, অপহরণকারীদের দাবি অনুযায়ী টাকা দেয়া হলে তারা আরও এ ধরনের অপরাধ করবে ফলে কোন শিশুই নিরাপদে থাকতে পারবে না। অপহরণ বাড়বে। তাদের ক্ষমতা পর্বত সমান হয়ে পড়বে। ফলে যেভাবেই হোক অপরাধীদের শাস্তি দিতেই হবে। তারা যদি অপহরণকারীদের খোঁজ পায়, তাহলে শার্লি রসেরও সন্ধান মিলবে।

সুপরিচিত নাগরিক ক্রিশ্চিয়ান রস অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিলেন। তাকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগুতে হবে। অপহরণকারীরা তার সন্তানের মুক্তিপণ বাবদ টাকা চেয়েছে। পুলিশকে কিছু না জানাতে নির্দেশ দিয়েছে। এগুলো সবই সতর্কতা মূলক উপদেশ। তিনি অপহরণকারীদের এসব নির্দেশ না মেনে পুলিশকে সবই জানিয়েছিলেন। আবার এটাও ভাবলেন তার ছেলে শার্লি রসের জীবন কতটা ঝুঁকিপূর্ণের মধ্যে রয়েছে। চারিদিকে এত ভাবনায়, তিনি যেন পাগল হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এটাও তাকে মনে রাখতে হবে কোনভাবেই আস্থির হওয়া চলবে না। ক্রিশ্চিয়ান রস ফিলাডেলফিয়ায় সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। তাকে সবাই একনামে চেনে, ফলে নানান চিন্তা ভাবনা করে, পুলিশের কাছে স্মরণাপন্ন হলেন। তার বিশ্বাস, পুলিশই পারবে সুষ্ঠু বিচার করতে। তারাই খুঁজে বের করতে পারবে শার্লি রসকে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ব্যক্তি স্বার্থের কথা চিন্তা না করে বরং পুরো সমাজের কথাই তাকে বিবেচনা করতে হবে। অপহরণকারীরা মুক্তিপণ দাবি করেছে, সেটা দেয়া হবে না। বরং পুলিশের সাহায্য নিয়ে এ সব অপরাধীকে গ্রেফতার করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী চেষ্টা করছিল তার সন্তানকে খুঁজে বের করতে। ফিলাডেলফিয়ার সর্বত্র গোপন স্থানে অনুসন্ধান করতে পুলিশ বিভাগ থেকে নির্দেশ জারি করা হল। শুধু তাই নয় অপরাধীদের যত আড্ডাস্থল আছে তা হামলা করা হবে সে নির্দেশ ও দেয়া হল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক শুরু হল ব্যাপক ধড়পাকড়। অবস্থা এমন দাঁড়াল, সাধারণ অপরাধীকেও সন্দেহে গ্রেফতার করল পুলিশ। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কারই রেহাই নেই। এমনকি তারা যেসব স্থানে মিলিত হয়, আড্ডা দেয়, সেখানেও পুলিশ হামলা চালাল। অনেকের গাড়ি বিশেষ করে মটর সাইকেল তদন্তের আওতায় নিয়ে এল গোয়েন্দারা। বাস্তবিক অর্থে যা দৃষ্টিগোচর হল, তাতে করে, প্রকৃত অপহরণকারীদের কোন সন্ধান মিলল না।

বরং অপরাহনকারীরা যা বলেছিল,

"পৃথিবীর কোন শক্তি নেই আমাদের হাত থেকে শার্লি রসকে কেউ বাঁচাতে পারে, সেটাই যেন সত্যে পরিণত হতে চলেছিল।"

BanglaBook.org

পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হাল ছেড়ে দিতে পারে না। হাত পা ঘুটিয়ে বসে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পোশাকধারী শত শত পুলিশ, সে সাথে গোয়েন্দা কর্মকর্তা ফিলাডেলফিয়াতে তন্ন তন্ন করে অপরাধীদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের আশা, তারা শার্লি রসকে অপরহনকারীদের কাছ থেকে মুক্ত করে আনতে পারবে। অপহরণকারীদের একবার সন্ধান পেলেই উপযুক্ত চাপ প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের দিন-রাত এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার কোথায় যেন ভুল ছিল বলেই মনে হল। এক পর্যায়ে তারা হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু কোন কূলকিনারা করতে পারল না। অপহরণকারীরা যেন তাদের থেকে আরো বেশি চালাক এবং প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন। আবার এমনও হতে পারে পুলিশের তথ্য যে কোনভাবে তাদের কাছে চলে যাচ্ছে।

৮ জুলাই, অপহরণকারীরা ক্রিশ্চিয়ান রসের কাছে দ্বিতীয়বার আর একটি চিঠি পাঠাল। তার বাসায় পোষ্ট বক্সে ফেলে রেখে আসল তারা।

চিঠিতে লেখা ছিল,

"শার্লি রসকে ফিরে পেতে চাইলে ২০ হাজার ডলার দিতে হবে। এক ডলার কম হলেও চলবে না।"

মুক্তিপণের পরিমাণ দেখেই ভেঙ্গে পড়লেন ক্রিশ্চিয়ান রস। একথা সত্য, ব্যবসায়ী হিসেবে ক্রিশ্চিয়ান রসের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। আবার এটাও সত্য, ১৮৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব তার উপর দিয়েও গেছে। ব্যবসা বাণিজ্যে অধঃগতি হয়েছিল। তার অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এ মুহূর্তে ২০ হাজার ডলার প্রদান করা তার জন্য কষ্টকর বৈকি।

আবার এটাও ভাবছে সন্তানের জীবন বলে কথা। বাবা হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না তিনি। কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না ক্রিশ্চিয়ান রস? তার ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যাংক কুঋণের জালে আটকে আছে। ব্যাংকের বিশাল ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না তিনি। এমনকি তার বিশাল বাড়ি ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখার চিন্তা ভাবনা করছিলেন। ক্রিশ্চিয়ান রস অপহরণকারীদের দাবীকৃত মুক্তিপণ পরিশোধ করতে পারতেন যদি তার কাছে নগদ টাকা থাকত। সেক্ষেত্রে তিনি পুলিশের কাছে ধর্না দিত না। অপহনকারিদের দাবি মিটিয়ে দিয়ে সন্তানকে মুক্ত করে নিয়ে আসতেন।

পুলিশ নতুন যুক্তি দাঁড় করাল। তাদের যুক্তি হচ্ছে, অপহরণকারীরা তাদের দাবীকৃত টাকা না পেলে শার্লি রসকে ছেড়ে দেবে। দাবীকৃত টাকা না পেলেই

BanglaBook.org

তারা হতাশ হয়েই শার্লিকে মুক্ত করে দেবে। পুলিশ কেন এরকম উদ্ভট চিন্তা করছে তা ক্রিশ্চিয়ান রসের মাথায় এল না।

অপহরণকারীরা চিঠিতে আরো লিখেছিল,

"তুমি যদি সন্তানের থেকেও টাকা বেশী ভালবাসা তাহলে বুঝতে হবে তুমিই সন্তানের খুনি। আমরা তোমার সন্তানকে অন্য কোথাও বিক্রি করে ঠিকই টাকা তুলে নিতে পারব। আমরা সেটা চাই না। তুমি নিশ্চয়ই সুবুদ্ধির পরিচয় দেবে।"

চিঠির এ অংশটি বারবার পড়ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান রস। কি করবেন তিনি। এ হুমকি তার জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকল। একইভাবে বাকি সব অভিভাবকদের জন্য এটা সতর্কবাণী। অন্যরা ভাবতে লাগল ভবিষ্যতে তাদের ক্ষেত্রে যদি এরকম হয় তাহলে তারা যতটা পারবে দাবী দাওয়া মিটিয়ে দেবে। শুধুমাত্র যারা ক্ষমতাবান তারাই অপহরণকারীদের সাথে কোন আপোষ করবে না। অবশ্য অপরাধী গোষ্ঠীদের হাতে রাখতে তারা আগে থেকেই অর্থ দিয়ে নিজেদের আয়ত্বে রাখে। অপরাধী গোষ্ঠী সহজে শিল্পপতিদের সন্তানকে অপহরণ করে না। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ভাবছিল পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ অপরাধীদের গ্রেফতার করবে, এবং শার্লি রসকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান রস ধীরে ধীরে সব বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে ফেলছিল। সবকিছু শূন্য মনে হচ্ছিল তার কাছে।

পুলিশ এবং ফিলাডেলফিয়ার নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে নব কৌশল গ্রহণ করল। অবশ্য তারা এ কৌশল জনসম্মুখে প্রকাশ করল না। ক্রিশ্চিয়ান রস নিজেও নতুন কৌশল সম্পর্কে জানতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। বরং অপহরণকারীরা তাকে দ্বিতীয় যে চিঠি দিয়ে মুক্তিপণ বাবদ অর্থ দাবী করেছিল সেটাই অনুসরণের চিন্তাভাবনা করছিলেন তিনি। ফিলাডেলফিয়াতে একটি বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করলেন তিনি।

পোস্টারে লেখা ছিলঃ

"রস, আমরা সমঝোতার জন্য প্রস্তুত"।

এ প্রস্তাব কোন পক্ষ থেকে এসেছিল তা বুঝতে পারছিলেন না ক্রিশ্চিয়ান রস। তার ধারণা এটা নতুন কোন কৌশল মাত্র। একথা সর্বজন বিদিত এবং অবধারিত, কৌশল অবলম্বনকারীদের বাস্তবিক অর্থে সমঝোতার কোন ইচ্ছা ছিল না। এটা তাদের টোপমাত্র। ফাঁদে ফেলার চেষ্টা। তারা সময় ক্ষেপনের চেষ্টা করছিল। ক্রিশ্চিয়ান রসের বুঝতে বাকী থাকল না, এটা পুলিশ ও গোয়েন্দা

BanglaBook.org

বিভাগের কাজ। তারা আসলে এ সমঝোতা প্রস্তাবের ভিত্তিতেই অপহরণকারীদের কাছ থেকে কিছু শুনতে ও জানতে চাচ্ছিল। অপহরণকারীরা কিছু বললেই বুঝতে পারবে কোথা থেকে তারা কথা বলছে। সেখানে হামলা করে শার্লি রসকে খুঁজে বের করে আনতে পারবে। ফলে নিশ্চিতভাবেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দ্বৈত খেলায় মেতে উঠল। তারা বুঝাতে চাইল অপরাধীদের সাথে সমঝোতা করতে ইচ্ছুক, আবার অপরাধীকে গ্রেফতারও করতে চায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ফিলাডেলফিয়াতে বড় বড় ব্যানার এবং পোস্টার দেয়ালে সেঁটে দিল। তারা শুধু একাজ করেই শান্ত থাকল না। পত্র-পত্রিকা প্রচার মাধ্যমে সবকিছু জানিয়ে দিল। পোস্টার এবং ব্যানার নিউইয়র্ক পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া হল। পুলিশ বিভাগ নড়েচড়ে বসল। এসব কিছু, অপহরণকারীদের চোখে পড়েনি তা নয়। তারাও চুপ করে বসে থাকেনি। হুমকি স্বরূপ পুনরায় রসকে চিঠি দিল।

তাতে লেখা ছিল ঃ

"গোয়েন্দা ও পুলিশের কাছে আপনি বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। আপনি ভাবছেন, তারা আপনাকে খুব সাহায্য করবে। আপনার সন্তানকে উদ্ধার করে দেবে। আমাদের গ্রেফতার করবে। আপনি ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছেন। আপনি কি শার্লি রসের সুস্থ জীবন চান না? নাকি সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন?"

ক্রিশ্চিয়ান রস এবং কমিটির নেতৃবৃন্দও এ চিঠি পড়ল। সবাই এটা উপলব্ধি করল, অপহরণকারীরা প্রকৃত অর্থেই শার্লি রসের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। তারা একের পর এক হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। এমনও হতে পারে অকথ্য মানসিক নির্যাতন করছে। আইন-শৃংখলা বাহিনী তার পরেও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে না। ক্রিশ্চিয়ান রস চুপ করে বসে না থেকে দাবীকৃত মুক্তিপণের টাকা যোগাড়ের চেষ্টা করছিল। সেটা পুলিশকে জানাননি। তার মধ্যে ভয় কাজ করছিল। ছেলেটির জীবন কি হল, ভেবেই বুক ভেঙ্গে কান্না আসছিল তার। তিনি যে টাকা যোগাড়ের চেষ্টা করছিলেন এবং তার এ অক্লান্ত চেষ্টার জন্য স্ত্রী সারাহ তাকে সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগান দিয়েছিল।

সারাহ বলল,

"সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

স্ত্রীর কথায় চুপ করে থাকলেন ক্রিশ্চিয়ান রস।

মনে মনে বললেন,

"কিছুই ঠিক হবে না।"

BanglaBook.org

পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই তার। জীবনে এ প্রথম আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে মৌন বিরোধিতা করলেন। তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। অপহরণকারীদের পাঠানো তৃতীয় চিঠি নিয়ে রসের সাথে নগর কমিটির বৈঠক হল। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু একটাই– অপহরণকারীদের সাথে কিভাবে অর্থের লেনদেন হবে, কে কে থাকবে, তারা কি ছেলেটিকে মুক্তি দেবে কিনা, নাকি অন্য কোন পরিকল্পনা আঁটবে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলঃ

একটা বড় ব্যানারে লেখা হবে-

"রস তোমাদের সাথে যোগাযোগ করবে।"

তবে শর্ত মানতে হবে।'

পাশাপাশি এটাও লেখা হল,

"শর্ত না মানলে রস আসবেন না।"

রস অবশ্য কমিটিকে জানিয়ে দিলেন শর্ত মেনে নিয়েই অপহরণকারীদের সাথে তিনি যোগাযোগ করবেন। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ ক্রিশ্চিয়ান রস ব্যাংকের কাছ থেকে ২০ হাজার ডলার ঋণ করবে। ঋণ পেলেই সে টাকা দেবে অপহরণকারীদের। অপহরণকারীরা তার ছেলেকে মুক্তি দেবে। তার কাছে ফিরিয়ে দেবে। এতেও বাধা দিল ফিলাডেলফিয়ার আইন শৃঙ্খলা কমিটি। তাদের বক্তব্য হচ্ছে,

"এ কাজ করলে তার অর্থ দাড়ায়, অপহরণকারীদের আপনিও সমর্থন করলেন। আইন অবজ্ঞা করলেন। রসের মত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, তিনি নিশ্চয়ই ডাকাতদের সমর্থন করতে পারেন না। তার উচিত হবে ফিলাডেলফিয়ার নগর পর্ষদ এবং পুলিশের প্রতি আস্থা রাখা। আইনানুযায়ী কাজ করতে হবে।"

গভীর মনোযোগের সাথে সভা পর্ষদের কথাগুলো শুনছিলেন ক্রিশ্চিয়ান রস। অবস্থা এমন তাকে যেন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। উভয় সংকটে পড়ে গেলেন তিনি। একদিকে অপহরণকারীদের হুমকি এবং অন্যদিকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ম্যারপ্যাঁচ। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তিনি সাংবাদিকদের সাথে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কথা বললেন, অপহরণকারীরা তাকে তৃতীয় চিঠি দিয়েছে, সে চিঠির সারমর্ম তুলে ধরলেন।

রস বললেন,

"আমি অবশ্যই সামর্থ্যানুযায়ী তাদের সাথে সাক্ষাত করব।"

BanglaBook.org

শার্লি রসের অপহরণ খুবই স্পর্শকাতর বিষয়ে পরিণত হল। সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে এ অপহরণের কাহিনী ছাপা হল। পত্রিকার প্রতিবেদকেরা যেন শিকারী কুকুরের মত ক্রিশ্চিয়ান রসের পিছনে ধাওয়া করতে থাকল। কারণে-অকারণে তাকে নানা প্রশ্ন করে বিরক্ত করতে থাকে সাংবাদিকরা। পুলিশ সব দিক থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী নগরীতে কড়া পাহারা শুরু হল। তারা নৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নিল মুক্তিপণ বাবদ অপহরণকারীরা যে টাকা দাবী করেছে, তা প্রদান করা হবে না। ক্রিশ্চিয়ান রসকে সেটাই জানিয়ে দেয়া হল। অপরহনকারীরা নিশ্চয়ই শার্লি রসের কোন ক্ষতি করার সাহস দেখাবে না। পুলিশের এসব কথা শুনে ক্রিশ্চিয়ান রস অবাক হচ্ছিলেন। এক অর্থে পুলিশের ভেড়াজালে আটকে গেছেন তিনি। তারাই তাকে বুঝাচ্ছিল অপরাধীদের গ্রেফতার করবেই। পুলিশের এসব মন্তব্য কর্ণপাত করছিলেন না ক্রিশ্চিয়ান রস। এমনকি ফিলাডেলফিয়া নগর পর্ষদ কমিটির মতামত থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন তিনি। সাধারণ মানুষের মতামত থেকে অনেক দূরে ছিলেন তিনি। শুধুমাত্র গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাদের কথা মেনে চলছিলেন। এর পাশাপাশি নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গোপনে ২০ হাজার ডলারের ব্যবস্থা করছিলেন। যতটা সম্ভব বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ঋণ করছিলেন।

এদিকে পুলিশ নতুন করে নানা স্থানে তল্লাশি শুরু করল। বিশেষ করে সন্দেহভাজন জিপসি সর্দার, যাদের চলনে-বলনে অপরাধী জগতের সাথে উঠা বসা তাদের অনেককে গ্রেফতার করা হল। বহু জেরা করার পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল।

যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তারা বলেছে,

"শার্লি রসকে তারা অপহরণ করেনি।"

পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ এটা বুঝতে পেরেছিল এসব অপরাধীরা কোন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সন্তানকে অপহরণের ক্ষমতা রাখে না।

পুলিশ এরপর নতুন কৌশল অবলম্বন করল। তারা এ কৌশল পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করল। পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত অপরাধীদের সাথে একটা চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্যই নতুন কৌশল অবলম্বন করল পুলিশ। এতে অনেক সময় সফলতা আসে। অপরাধীরা অনেক সময় পুলিশের টোপ বুঝতে ব্যর্থ হয় তখন তাদের দেয়া প্রস্তাবে সম্মত হয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশ এমন কোন কৌশল অবলম্বন করবে যা কেউই জানে না?

BanglaBook.org

এমনকি অপরাধীরাও বুঝতে পারবে না। একপ্রকার অবাস্তব চিন্তা করছিল পুলিশ। এভাবে বছর পার হতে থাকে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী যেন ছেলেমানুষি আচরণ করছিল। তাদের মধ্যে কোন পেশাদারিত্বের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ইচ্ছাকৃতভাবে জটিলতা সৃষ্টি করছিল। পুলিশ নতুন যে কৌশল প্রয়োগ করেছিল, সেটা অবশ্য অপহরণকারীদের ক্ষেত্রে একেবারে নতুন ছিল। তারাও বিষয়টি বুঝতে পারেনি প্রথমে। তারাও অবুঝ শিশুর মত আচরণ করল। এ বিষয়টি পরিষ্কার ফুটে উঠল কৌশলগত দিক থেকে দু'পক্ষ আনাড়ি সুলভ আচরণ করছিল। উভয়পক্ষই ফোনে আলাপের মাধ্যমে সমঝোতার কথা বলে শুধুমাত্র সময় ক্ষেপণ করছিল। এতে করে দু'পক্ষই নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা পরোক্ষভাবে সুসংগঠিত করছিল।

অপহরণকারীরা নিজেদের বিপদ বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে গেল। তবে তারা দমে যায়নি। তারা ক্রিশ্চিয়ান রসকে চতুর্থ চিঠি পাঠাল।

তারা লিখল,

"বারবার আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে কিন্তু আপনি কোন ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছেন না। আর এটা কি খুবই জরুরী যে গোয়েন্দা সংস্থার সাথে আলোচনা করে আপনি কালক্ষেপণ করবেন। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ বিপর্যস্ত হতে পারে। আপনার সন্তানকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছি তা গোয়েন্দা সংস্থা ইহজনমে খুঁজে পাবে না। আপনাকে আর বেশি সময় দেব না।"

এ চিঠিতে আর সময়ের কথা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করল না অপহরনকারীরা বরং ক্রিশ্চিয়ান রসের ছেলের ভাগ্য তার উপরই ছেড়ে দিল।

তারা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল,

"টাকা যোগাড় করতে আপনি আর কত সময় নেবেন।"

অপহরণকারীরা চিঠির মাধ্যমে একেবারে ব্যবসায়িক কথা বলল।

তারা বলল,

"নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ী সব সময় আরেকজন নির্ভরযোগ্যকে বিশ্বাস করে। তার উপর আস্থা রাখে। রস আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এ চিঠি আদান প্রদান করতে আমাদের এ পর্যন্ত ১ হাজার ডলার খরচ হয়েছে। আর চিঠি আদান প্রদান করতে চাই না।"

চূড়ান্ত হুমকি প্রদান করল অপহরণকারীরা,

"আপনি কি সত্যিই সন্তানকে ফিরে পেতে চান? তার মুক্তি চান কি?"

BanglaBook.org

এ হুমকির নয়দিন পর ক্রিশ্চিয়ান রস চিঠির উত্তর দিলেন। তবে সন্তানের নামে চিঠি পাঠালেন।

চিঠিতে লিখলেন,

"শার্লি রস, তুমি চিন্তা করনা। আমি টাকা যোগাড় করেছি। খুব শীগগীরই অপহরণকারীদের কাছে মুক্তিপণের টাকা পৌঁছে যাবে।"

অপহরণকারীরা এ চিঠি পাওয়ার পর পাল্টা জবাব দিল।

তারা লিখল,

"ক্রিশ্চিয়ান রস, আমাদের আর বলার কিছুই নেই। আপনার প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা সন্তানের জীবন আপনার হাতে।"

পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ক্রিশ্চিয়ান রস। মহাসড়কের পাশে বিশাল ব্যানারে অপহরণকারীরা তাদের নিজস্ব মতামত লিখে রাখল। তারা ক্রিশ্চিয়ান রসের বাড়ির সামনে ব্যানার টানিয়ে দিল। এ কাজ তারা করল যতক্ষণ না পর্যন্ত চতুর্থ চিঠির জবাব পেল ততক্ষণ নিজস্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যানারে লিখে তাদের কথা জানিয়ে দিল। প্রতি মুহূর্তে তারা এ কাজ করতে থাকল। কয়েকদিন পর অপহরণকারীরাও ক্ষান্ত দিল। তারা আর কোন কথাই বলল না। সব কিছু যেন স্থবির হয়ে গেল। শার্লি রসের বাবা-মা ভাবছিল অপহরণকারীরা যে হুমকি দিয়েছিল, সময়মত মুক্তিপণ না পেলে শার্লি রসকে হত্যা করবে তারা। হয়তো সেটাই করেছে।

১২ জুলাই, রোববার। সেদিনটি ছিল একেবারে নিরব নিথর। উভয়পক্ষের পক্ষের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যাওয়ার তৃতীয় দিন। পুরপুরি সতর্ক ছিল পুলিশ। তারা একটা বিষয় অনুভব করল, কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। এটা খুবই জরুরী। পুলিশ সিদ্ধান্ত নিল অপহরণকারীদের কাছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চিঠি পৌঁছে দেবে। সেভাবে প্রস্তুতি নিল তারা।

চিঠিতে লিখল,

"রস, আমরা চতুর্থ চিঠি পেয়েছি। মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করব খুব তাড়াতাড়ি।"

অপহরণকারীদেরকে যে এ চিঠি দিয়েছে পুলিশ, সেটা জানতেন না ক্রিশ্চিয়ান রস। পুলিশের আকস্মিক এ সিদ্ধান্তের ফল ভাল হল না। ক্রিশ্চিয়ান রস এবং তার স্ত্রী সারা রসের সন্তান ফিরে পাওয়ার আশা সম্পূর্ণভাবে শেষ হল। এ চিঠির পর অপহরণকারীরা কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ এবং ক্রিশ্চিয়ান রসের পরিবার– উভয় পক্ষই যেন শোকার্ত পরিবেশের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ করে আবার আশার আলো দেখতে পেলেন

BanglaBook.org

$20,000 REWARD

Has been offered for the recovery of CHARLIE BURWELL ROSS, and for the arrest and conviction of his abductors. He was stolen from his parents in Germantown, Pa., on July 1st, 1874, by two unknown men.

DESCRIPTION OF THE CHILD.

The accompanying portrait resembles the child, but is not a correct likeness. He is about four years old; his body and limbs are straight and well formed; he has a round, full face; small chin, with noticeable dimple; very regular and pretty dimpled hands; small, well-formed neck; full, broad forehead; bright dark-brown eyes, with considerable fullness over them; clear white skin; healthy complexion; light flaxen hair, of silky texture, easily curled in ringlets when it extends to the neck; hair darker at the roots,—slight cowlick on left side where parted; very light eyebrows. He talks plainly, but is retiring, and has a habit of putting his arm up to his eyes when approached by strangers. His skin may now be stained, and hair dyed,—or he may be dressed as a girl, with hair parted in the centre.

DESCRIPTION OF THE KIDNAPPERS.

No. 1 is about thirty-five years old; five feet nine inches high, medium build, weighing about one hundred and fifty pounds; rather full, round face, flared across the nose and cheek-bones, giving him the appearance of a hard drinker; he had sandy moustache, but was otherwise clean shaved; wore eye-glasses, and had an open-faced gold watch and gold vest-chain; also, green shave-bottom.

No. 2 is older, probably about forty years of age, and a little shorter and stouter than his companion; he wore chin whiskers about three inches long, of a reddish-sandy color; and had a pug-nose, or a nose in some way deformed. He wore gold bowed spectacles, and had two gold rings on one of his middle fingers, one plain and one set with red stone.

Both men wore brown straw hats, one high- and one low-crowned; one wore a linen duster; and, it is thought, one had a duster of gray alpaca, or mohair.

Any person who shall discover or know of any child, which shall give a reason to believe may be the one abducted, will at once communicate with their Chief of Police or Sheriff, who has been furnished with means for the identification of the stolen child.

Otherwise, communications by letter or telegraph, if necessary, will be directed to either of the following officers of

PINKERTON'S NATIONAL DETECTIVE AGENCY.

[illegible] FRANKLIN, Sup't, 40 S. Third St., Philadelphia, Pa.
E. A. PINKERTON, Sup't, 58 Exchange Place, New York.
F. WARNER, Sup't, 167 and 169 Fifth Avenue, Chicago, Ill.
GEO. H. BANGS, Gen'l Sup't.

ALLAN PINKERTON.

PHILADELPHIA, *August 22d, 1874.*

(POST THIS UP IN A CONSPICUOUS PLACE.)

২০ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়

ক্রিশ্চিয়ান রস এবং তার স্ত্রী। তাদের কাছে আবারও চিঠি এল। এটা ছিল পঞ্চম চিঠি।

এতে লেখা ছিল,

"রস, আপনাকে আমরা সর্বশেষবারের মত নির্দেশ দিচ্ছি, দ্রুত ২০ হাজার ডলার প্রদানের ব্যবস্থা করুন। যত দ্রুত দিতে পারবেন ততই মঙ্গল হবে। টাকা পাওয়ার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে শার্লি রসকে বাসায় পৌঁছে দেব। আমাদের কথাই শ্বাশত সত্য। এর মধ্যে কোন ছলচাতুরী নেই।"

তারা আরো জানাল,

"টাকা পেলে আপনার সন্তানকে আটকে রাখব না। বরং এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব তাকে সুস্থ মতে বাসায় পৌঁছে দেয়া। এ ব্যাপারে আমাদের উপর আস্থা রাখতে পারেন।"

এ চিঠি নিয়ে পুলিশ এবং ফিলাডেলফিয়ার নাগরিক পর্ষদ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করল। তারা অন্তত এটুকু বুঝতে পারল, অপহরণকারীরা তাদের দাবীকৃত মুক্তিপণের টাকা পেলে শার্লি রসের কোন ক্ষতি করবে না। এমনকি এটা নিশ্চিত এখন পর্যন্ত শার্লিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মেরে ফেলেনি। এতকিছুর পরও শার্লি রসের জীবন হুমকির মুখে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়নি পুলিশ। বরং তারা ভাবছিল অপরহরণকারীদের ব্যবসায়ের কথা। মুক্তিপণ পেলেই অন্য কোথাও পাড়ি দেবে। তারা নিত্য নতুন তথ্য হাজির করছিল। পুলিশের বক্তব্য হচ্ছে, মুক্তিপণ পেলেই অপহরণকারীরা আরো দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে এবং অন্য আরো বাচ্চা ছেলেকে অপহরণ করবে। পুলিশ দৃঢ়ভাবে জানাল, তাদের দাবি মেনে নেয়া যায় না। নাগরিক কমিটি ক্রিশ্চিয়ান রসকে চাপ দিল। তিনি যেন কিছুতেই অপহরণকারীদের মুক্তিপণের টাকা না দেয়।

তারা বলল,

"তিনি কি জানেন সন্তানকে ফিরে পাওয়ার জন্য নতুন করে কি ধরনের বিপদ ডেকে আনছেন?"

ক্রিশ্চিয়ান রস কিছুই ভাবতে পারছিলেন না। বাস্তবিক অর্থে তার সব চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যখন বিছানায় শুয়ে থাকেন তখন খুব বেশী খারাপ লাগে। সন্তান শার্লির বিছানা খালি পড়ে আছে। বাবা হয়ে তিনি কি করে এটা সহ্য করবেন? সন্তানের জীবন আজ হুমকির মুখে। তিনি তাকে বাঁচাতে পারছেন না। এ ব্যর্থতা তার নিজের। সব ভাষা যেন হারিয়ে গেছে।

স্ত্রী সারা রস জিজ্ঞেস করল,

"শার্লিকে কখন বাসায় নিয়ে আসবে?"

BanglaBook.org

ক্রিশ্চিয়ান রস শুধু আশ্বাস দিতে পারে। এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। নাগরিক কমিটির বৈঠকে যে আশ্বাস দেয়া হচ্ছিল তাতে বিন্দুমাত্র আস্থা ছিলনা সারা রসের। কেমন করেই বা থাকবে? তারা শুধু আলোচনাই করে যাচ্ছিল। সময় ক্ষেপণ করছিল। অপহরণকারীরা মুক্তিপণ না পাওয়া পর্যন্ত শার্লি রসকে ছাড়বে না, এটা বুঝতে পুলিশ আর নাগরিক কমিটির কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এটাই সত্য। তারা বুঝেও না বোঝার ভান করছিল। ক্ষতি যা হওয়ার তা হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান আর সারা রসের। কারণ আজ তারা সন্তানহারা। সন্তান বেঁচে থেকেও, কিভাবে আছে তারা তা জানে না।

সারা রসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ তিনি মা। সন্তানের কষ্ট তার থেকে বেশি কেউই উপলব্ধি করবে না। বুঝতেও চাইবেনা। তিনি কোন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন না।

অপহরণকারীরা যে পরিমাণ টাকা দাবী করেছিল সেটা নিয়েও তিনি ভাবেন না। তার একটাই চিন্তা সব সম্পদের বিনিময়ে হলেও সন্তানকে ফেরত চান তিনি। সন্তানকে ফিরে পেতে কে, কোন আইন ভঙ্গ করল তা ভাবার সময় নেই তার। সমাজ, সংসার, জাতি, রাষ্ট্র কিভাবে দেখল, কি চিন্তা করল, তাতে সারা রসের কিছুই যায় আসে না। যত দ্রুত হবে ততই মঙ্গল।

সারা রস তার স্বামীর কথা মনোযোগ সহকারে শুনছিল বটে কিন্তু তাতে তার মনের ভিতর কোন প্রভাব পড়েনি। ক্রিশ্চিয়ান রস তাকে পুলিশ এবং নাগরিক কমিটির কৌশল ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাল। এতে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি সারা রস। এসব সভা সমিতির প্রতি তার কোন আস্থা কোনকালেও ছিল না। আর এ কারণে বিশেষ বৈঠকে তাকে ডাকা হয়নি। ঐ বৈঠকে শুধু পুরুষরাই ছিল। একজন ভাল স্ত্রীর গুণ হচ্ছে কখনই সে তার স্বামীর সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করে না। সারা রস তাই চুপ করে বসেছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কোন কথাই বলবেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। একটা ক্ষেত্রে তিনি অবাধ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে মাঝে মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। সন্তানের চিন্তায় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন।

ক্রিশ্চিয়ান রস একেবারে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, একদিকে অপহরণকারীদের মুক্তিপণের টাকা দাবী করছে, অন্যদিকে পুলিশের নিষেধাজ্ঞা। তার উপর স্ত্রী আবার অসুস্থ। মুক্তিপণের টাকা যোগাড় করতে তার কোন সমস্যা হয়নি। তিনি এ টাকা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ঋণকরতে পারেন। এ সময় এক আগন্তুক ব্যক্তি তাকে ২০ হাজার ডলার দিতে চাইল। তাকে প্রস্তাবও দিল। এ ধরনের প্রস্তাবে হতবাক হলেন ক্রিশ্চিয়ান রস। এ

BanglaBook.org

আগন্তুক একজন উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপরাধী। সে জেল খেটেছে। সে টাকা দিতে চাচ্ছে। টাকা দিতে সে যেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এমনই ভাব করছিল।

নাগরিক কমিটি ক্রিশ্চিয়ান রসের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারছিল না। তিনি অপহরণকারীদের সাথে আর্থিক বিষয়ে কোন সমঝোতা করেনি সে ব্যাপারে নাগরিক কমিটি নিশ্চিত হতে পারছিল না।

অপহরণকারীদের মধ্যেও অস্থিরতা দেখা দিল। তারা আর সময় দিতে চাচ্ছিল না। সর্বশেষ সময় বেঁধে দিল ২৪ ঘণ্টা। নতুন পরিকল্পনা আঁটল অপহরণকারীরা।

তারা ক্রিশ্চিয়ান রসকে জানিয়ে দিল এবং সতর্ক করে দিয়ে বলল,

"কোন প্রকার মিথ্যা আশ্বাস এবং ভুল তথ্য প্রেরণ করলে আপনার সন্তান বাঁচবে না। আপনার সাথে আমাদের ব্যবসায়িক লেনদেনও শেষ হয়ে যাবে।"

ক্রিশ্চিয়ান রস একটা মিথ্যা বিজ্ঞাপন সেঁটে দিল।

তাতে লিখলেন,

"রস, আমি প্রস্তুত। আমি আমার কথা রেখেছি। কিন্তু কেউই ২০ হাজার ডলার নিতে আসেনি।"

দু'সপ্তাহ উভয় পক্ষই শান্ত থাকল। শার্লির অপহরণ কাহিনী সবাই ভুলতে বসেছে। এর মধ্যে আবার শুরু হল চিঠি আদান-প্রদান। ফিলাডেলফিয়া ডাকঘর থেকে চিঠি বিতরণ করা হল। পুলিশের কড়া নজর এড়িয়ে তা পোস্ট করা হল। পুলিশ এবং ডাক বিভাগ এত সতর্ক থাকার পরও কে বা কারা চিঠি পোষ্ট করল তা বুঝতে পারেনি কেউই। পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে দোষারোপ করল প্রচার মাধ্যমকে।

সাংবাদিকরাও ক্ষিপ্ত হয়ে বলল,

"এটা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য হুমকি স্বরূপ।"

পুলিশের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করল সাংবাদিকরা। পুলিশের অদক্ষতাই প্রকাশ পেল। পুলিশ গর্দভ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন কথাই বলতে থাকে প্রচার মাধ্যম।

পুলিশ ও সংবাদপত্রের এ লড়াইয়ে ক্ষতি একজনেরই হচ্ছে, তা হল ক্রিশ্চিয়ান রসের। কে, কাকে, কিভাবে চিঠি পাঠানো হয়েছিল সেটা বড় বিষয় নয়। মুক্তিপণের দাবীকৃত টাকা চেয়ে অপহরণকারীরা ৬ষ্ঠ বারের চিঠি পাঠিয়েছিল। মেইল করা হয়েছিল ফিলাডেলফিয়ার প্রধান সড়কের পোষ্ট অফিস থেকে। ফলে কে ডাক বাক্সে চিঠি ফেলেছিল সেটা প্রধান বিষয় হতে পারে না। এ যোগাযোগ তাই ক্ষমাযোগ্য।

অপহরণকারীরা দীর্ঘদিন যোগাযোগ করতে পারেনি তার কারণ তারা জানিয়েছিল।

BanglaBook.org

তারা চিঠিতে বলে,

"আমরা বেশ কিছুদিন দেশের বাইরে ছিলাম। পুরানো শত্রুর সাথে হিসাব মেটাতেই দেশের বাইরে যেতে হয়েছিল। ফলে আসতে দেরি হয়েছে। আমরা যদি হিসাব না মেটাতাম তাহলে কথার বরখেলাপ হত। একটা কথা মনে রাখবেন, অপহরণকারীরা আর যাইহোক কথার মূল্য দেয়। আপনাকে আবারো সতর্ক করে দিচ্ছি আপনার কাছে আসব দাবীকৃত টাকার জন্য। গোয়েন্দাদের জানালে বিপদ হবে।"

মূলত ৬ষ্ঠ চিঠির ভাষা ছিল এরকম ঃ

"প্রিয় বন্ধু, আপনাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছি। আপনার ভালোর জন্যই তা দিচ্ছি। কোন প্রকার ঝামেলায় জড়াতে চাই না। গোয়েন্দা সংস্থাকে টেনে আনবেন না। এতে আপনারই ক্ষতি। আমরা যা কিছু করি, তা আমাদের স্বার্থেই। সামাজিক কিছু স্বার্থ রয়েছে বটে। ফলে আপনি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করুন। পবর্তসম সমস্যা নিয়ে বেশীক্ষণ কেউই স্থির থাকতে পারে না।"

ক্রিশ্চিয়ান রসের কাছে এ চিঠি পৌঁছল ১৬ জুলাই। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। এ চিঠির ভিত্তিতে ক্রিশ্চিয়ান রস সিদ্ধান্ত নিলেন ২০ জুলাই মুক্তিপণের টাকা পৌঁছে দেবেন। অপহরণকারীদের পক্ষে যে আসবে সে এক হাতে টাকা নেবে আরেক হাতে ছেলে শার্লি রসকে ফিরিয়ে দেবে।

পুলিশ ভাবছিল ভাবছিল অপরাধীরা কোন সাধারণ মানের নয়। তারা এখনও শার্লি রসকে হত্যা করেনি। যেহেতু তাদের টাকার প্রয়োজন সেজন্য তারা শার্লিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ক্রিশ্চিয়ান রসের বাড়ির আশপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে পুলিশ। গোয়েন্দারাও কাজে নেমে পড়ে। তারা দেখতে চাইল অপরহনকারীদের পক্ষ থেকে টাকা নিতে কে আসে? পরিকল্পনা করল, যে আসবে সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করবে। অপরাধীদের একজনকে, গ্রেফতার করতে পারলেই তার মাধ্যমে সব তথ্য বেরিয়ে আসবে। তখন শার্লি রসকে মুক্ত করে আনা সহজ হবে।

শুক্রবার রাত থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত টানা ৪৮ ঘণ্টা সারা এবং ক্রিশ্চিয়ান রস অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকে। তাদের শুধু একটাই মনে হচ্ছিল, এ বুঝি কেউ এসে দরজায় কড়া নাড়ল। তাদের সাথে ছিল পাহারাদার। তাদেরকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল যেন কেউই দেখতে না পায়। সে সাথে গোয়েন্দারাও ছিল। উত্তেজনা, উৎকণ্ঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হল। পুরো বাড়িতে একেবারে নিরব পরিবেশ। কিন্তু কোন বার্তাবাহকই এল না। হতাশ হল সবাই।

BanglaBook.org

অপহরণকারীরা তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টাল। এর পিছনে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছিল সংবাদপত্র। ক্রিশ্চিয়ান রসের বাসায় কিভাবে গোয়েন্দারা ঘোরাফেরা করছিল তা পত্রিকায় লেখা হল। অপহরণকারীরা সেটা পড়ে জানতে পারল। আর সে কারণেই তারা ক্রিশ্চিয়ান রসের বাসায় কোন লোককে মুক্তিপণের টাকা আনতে পাঠায়নি।

তারা রসকে জানাল,

"আপনি দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। রস, আমরা ঠিক বুঝতে পারছিনা কেন আপনি এরকম করছেন। সত্যিই কি আপনি মুক্তিপণ বাবদ দাবীকৃত ২০ হাজার ডলার পরিশোধ করতে ইচ্ছুক? গোয়েন্দাদের সাথে হাত মিলিয়ে, পরামর্শ করে কোন লাভ হবে না। তারা কিছুই করতে পারবে না। বরং ক্ষতি হবে আপনারই। সন্তানকে জীবিত ফিরে পাবেন না। এটা ঠিক আমাদেরও কিছু ভুল হয়েছিল। মাঝখানে দু'সপ্তাহ আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। শার্লি রসের জীবন এখন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার দিকে মোড় নিচ্ছে। আমাদের ধারণা, ছেলের জীবনটা জুয়ার আসর মনে করছেন। নয়তো'ছেলের জীবন থেকে টাকাকে বেশি মূল্যবান মনে করছেন আপনি। আর বেশি দেরি করার অর্থ একটাই তা হচ্ছে আমরা পরিকল্পনামত কাজ করব। এতকিছুর পরও আপনাকে শেষবারের মত বলছি, চুক্তি মোতাবেক টাকার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে, অথবা কারো সাহায্য নিয়েই হোক আপনি কবে, কোথায় টাকা পাঠাবেন তা জানাবেন।"

এদিকে এ অপহরণের ঘটনা ফিলাডেলফিয়ায় এমনভাবে আলোচনা হচ্ছিল, যে সব দোষ পুলিশের উপর চাপল। পুলিশ কিছুই করতে পারছিল না। জনগণের সমালোচনা বন্ধ করতেই হোক বা নিজেদের ক্ষমতা প্রমাণের জন্যই হোক সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম উডস্টার। এ ব্যক্তি বহুদিন যাবত অপহরণ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করল যে শার্লি রসের অপহরণকারীদের সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে। মুক্তিপণের চিঠি সে-ই লিখে দিয়েছে। বাস্তবে এমন কোন ঘটনাই সে ঘটায়নি। উডস্টারকে জেরা করা হল। নির্যাতন করা হল তাকে। এক পর্যায়ে জানা গেল সে নির্দোষ। অপহরণকারীদের সাথে তার কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ নেই। অপহরণকারীরা বেশ সময় নিল। এর ফলে সুবিধা হল উডস্টারের। সে নতুন কিছু তথ্য দিল। নীতিগতভাবে পুলিশকে তথ্য দিতে সম্মত হল।

নিজের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলল,

"কোন বাচ্চাকে অপহরণ করার থেকেও সহজ কাজ হচ্ছে, তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিক্রি করে দেয়া।"

BanglaBook.org

পুলিশকে অন্য তথ্য দিল সে। তারপর তাকে মুক্তি দিল পুলিশ। পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলো উডস্টারকেই প্রথমে দোষী সাব্যস্থ করেছিল। তাদের ধারণা, অপহরণকারীদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। মুক্তি পাওয়ার পর উডস্টার প্রথম যে কাজটি করলেন, তা হচ্ছে নিউইয়র্ক হেরাল্ডের কাছে তার বক্তব্য তুলে ধরলেন। নিউইয়র্ক হেরাল্ডে সম্পাদকীয় পাতায় শার্লি রসের অপহরণ কাহিনী বিশদভাবে প্রচার করল। এ কাজ, পেশাদারী অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে সেটা প্রমাণ করতে চাইল তারা।

নিউইয়র্ক হেরাল্ডের এক প্রশ্নের জবাবে উডস্টার জানিয়ে দিল,

"অপহরণকারীরা মুক্তিপণের টাকা যতক্ষণ না পাবে ততক্ষণ মুক্তি দেবে না শার্লিকে।"

তার যুক্তিটাও গ্রহণযোগ্য। অপহরণকারীরা অপরাধ করেছে। অপরাধ করাই তাদের পেশা। ফলে কেন, এবং কোন কারণে তারা মুক্তিপণ না পেয়ে শার্লি রসকে ছেড়ে দিয়ে একেবারে নির্বাসনে চলে যাবে? এটা ভাবার যৌক্তিক কোন কারণ নেই আর এ ধরনের ঘটনা যখন ঘটে তখন সমাধানের পথ একটাই আর তা হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব মুক্তিপণ দিয়ে চলে আসা। এদিকে ফিলাডেলফিয়ার নাগরিকদের মধ্যে ভীতি কাজ করছিল। বিশেষ করে বিত্তবান শ্রেণী ভীত হয়ে উঠল এ ঘটনায়। কখন কার বাচ্চা অপহরণ হয় কে জানে? অপহরণকারীরা ধনীক শ্রেণীর সন্তানকে আটকে রাখে। ক্রিশ্চিয়ান রসের মত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর পক্ষে ২০ হাজার ডলার দিতে সমস্যা হবে না ভেবেই তার সন্তানকে অপহরণ করেছিল অপরাধীরা। সমাজের শীর্ষ ব্যক্তিদের কথা হচ্ছে, অপহরণকারীদের যদি এতই ক্ষমতা তাহলে রাষ্ট্রের অর্থ খরচ করে পুলিশ বাহিনী রাখার দরকার কি?

সাধারণ মানুষের বক্তব্য হচ্ছে,

"পুলিশ গর্দভ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা পারে নিরীহদের অত্যাচার করতে।"

নাগরিক সমাজের অভিযোগ, পুলিশের অদক্ষতার কোন শেষ নেই। হিসাব কষে বলাও সম্ভব নয়। তারা সব সময় নানা অজুহাতে সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিতে পারে। কোন পেশাদারি অপরাধীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। আর সাফল্য ও প্রশংসা নিতে বিন্দুমাত্র পিছপা হয় না।

পুলিশের এ ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করল সংবাদপত্র। তাদের বিরুদ্ধে পাহাড়সম অভিযোগ দাঁড় করাল। পুলিশকে দিয়ে এ অপহরণের ঘটনার সমাপ্তি ঘটবে না তা সবাই বুঝে ফেলল। এর ফলে বেশকিছু প্রতিবেদক নিজের উদ্যোগেই গোয়েন্দাগিরি শুরু করল। তারা চেষ্টাও করল যেভাবেই হোক

BanglaBook.org

অপহরণকারীরা কোথায় লুকিয়ে আছে, তা জানা এবং সে সব তথ্য পত্রিকায় প্রকাশ করা। পত্রিকার প্রতিবেদকরা অনেক গোপন তথ্য পেল যেগুলো পুলিশ এড়িয়ে গিয়েছিল। এমনও হতে পারে, তাদের মাথায় এসব চিন্তাই আসেনি। পত্রিকা থেকে এ প্রস্তাব দেয়া হল, সিটি মেয়র ঘোষণা দিক অপহরণকৃত বাচ্চাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। পত্রিকার এ প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন ফিলাডেলফিয়ার মেয়র স্টকলো।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বললেন,

"যখন কোন জিনিস চুরি যায়, আমি মনে করিনা, সেটা ফেরত পাব, বরং যে চুরি করেছে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

তিনি আরো বললেন,

"যদি কেউ চুরি যাওয়া পণ্য ফিরিয়ে আনতে চোরকে চাপ দেয় এবং চোরকে জেলে না নেয় তাহলে সে-ই পুলিশ অফিসারকে একেবারে ছাঁটাই করে দেয়া হবে।"

তাহলে কি শার্লি রসকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করবে না কেউ? মেয়র স্টকলের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অনেকেই একমত হতে পারল না। আর যুক্তরাষ্ট্রে মানবাধিকার বিষয়টি একেবারে বিনা তর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফলে মেয়রের বিশ্বাস বা চিন্তাধারা অন্যের সাথে মিলতে হবে তার কোন যৌক্তিকতা নেই। মেয়র তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যেসব মন্তব্য করছেন, সেটা সাংবিধানিক কথা মাত্র।

ছেলে অপহরণ হয়েছে এ কষ্ট একমাত্র ক্রিশ্চিয়ান রসই বুঝতে পারছেন, কতটা জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে তার সেটা বুঝার শক্তি অন্য করও নেই। মেয়রের কথা মত চললে তাহলে বলতে হয়, তার ছেলে যেন চুরি যাওয়া পণ্য। সেটা ফিরে না পেলে কিইবা এমন ক্ষতি? এ ধারণা আর সবাই করতে পারলেও বাবা হয়ে তিনি তা পারেন না। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা মেনে নেয়া যায় না। ক্রিশ্চিয়ান রস নিজেও নাগরিক পর্ষদের সদস্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি মুক্ত হতে পারেন না।

অপহরণকারীরা সব তথ্য জানতে পারল। তারা পত্রিকার মাধ্যমে মেয়র এবং শার্লি রসের ধ্যান ধারণা বুঝে ফেলল।

পত্রিকায় ক্রিশ্চিয়ান রসের যে সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল তা মনোযোগ সহকারে পড়ল অপহরণকারীরা।

সাক্ষাতকারে তিনি বলেন,

"এসব অপহরণকারীদের প্রতি কোন আস্থা নেই এবং তারা যে দাবী করেছে তা পূরণ করব না। কোনভাবেই আমার সন্তানের জীবন নিয়ে চিন্তিত নই। এখন পর্যন্ত অপহরণকারীদের প্রাপ্ত চিঠি থেকে এটা নিশ্চিত হয়েছি ছেলে

BanglaBook.org

নিরাপদে আছে এবং সুস্থ রয়েছে। অপহরণকারীদের খোঁজার অর্থ এই নয়, তাদেরকে টাকা প্রদান করা হবে। এর জন্য আমার সন্তানকে হয়তো তারা কষ্ট দিচ্ছে, নির্যাতন করছে।"

ক্রিশ্চিয়ান রস কি চাচ্ছেন সেটাই অনুধাবন পারছিল না অপহরণকারীরা। তার বক্তব্য পড়ে সন্দেহ জাগল।

এক স্থানে তিনি বলেছেন,

"আমার সন্তান কথাটি না বলে বরং বলেছে 'বাচ্চাটির জীবন' হুমকির সম্মুখীন।"

একজন পিতার পক্ষে এটা কি বলা সম্ভব? এটাই ভেবে পাচ্ছে না অপহরণকারীরা। আর তিনি কিভাবেই বা বলতে পারেন অপহরণকারীদের সাথে কখনোই কোন প্রকার চুক্তি করবেন না? ইতিপূর্বে বহুবার তিনি অপহরণকারীদের কাছে কারো না কারো মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছেন। মুক্তিপণ দিতে অঙ্গীকারও করেছেন। পত্রিকায় সাক্ষাতকারে তিনি যা বলেছেন আর তার কর্মকাণ্ড– দু'টো কি পরস্পরবিরোধী হয়ে যায় না? তিনি নিজেই কি বিতর্কের জন্ম দিচ্ছেন না? অপহরণকারীদের প্রতি তার যদি আস্থাই না থাকবে তাহলে তারা যখন বলছে, আপনার সন্তান সুস্থ আছে সে কথা কেমন করে তিনি বিশ্বাস করেন? সেটা মেনে নেন কিভাবে?

একইভাবে বলা যায়, তার সন্তানকে জীবনের হুমকি দেয়া হচ্ছে, এটা যদি সত্য মনে না হয় এবং একথা বিশ্বাস না করেন তাহলে তিনিই আবার কি করে বলেন,

"টাকা না পরিশোধ করলে সন্তানকে বাঁচাতে পারব না।"

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় নাগরিক পর্ষদের সাথে ক্রিশ্চিয়ান রসের যে বৈঠক তা পত্রিকায় একটি দিক বিবেচনা করে বর্ণনা করেছিল। এটা কেউ জানে না এবং বুঝতেও চায়নি কমিটির বিরুদ্ধে কতটা লড়াই করতে হয়েছিল রসকে। তার দুঃখ, কষ্ট নতুন করে বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন আছে কি? কমিটির কাছে যে বিবৃতি তিনি দিয়েছেন সেটা অপহরণকারীরা জানতে পারল যে মুক্তিপণের টাকা কখনোই তিনি পরিশোধ করবেন না। বাস্তবিক অর্থে এমনও সম্ভাবনা ছিল যে রস নীতিগতভাবে অপরাধীদের সাথে সমঝোতা করতে পারত এবং সেটাই তিনি চেয়েছিলেন। বিশেষ করে ২২ জুলাই পুরো ফিলাডেলফিয়াতে হ্যান্ডবিল বিতরণ করা হল, আর ঠিক তখনই তার মনে হয়েছিল, ব্যক্তিগত উদ্যোগে অপহরণকারীদের সাথে সমঝোতার প্রয়োজন ছিল। ক্রিশ্চিয়ান রসকে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করতে চাইল ব্যাংক। মেয়র স্টোকলের সাথে বৈঠক করে বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িরাও এগিয়ে আসার ইচ্ছা পোষণ করল।

BanglaBook.org

"ব্যাংকের তরফ থেকে বলা হল, "এই অর্থ প্রদান করা হচ্ছে শার্লি রসকে মুক্তির জন্য। তার বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা দূর হবে সে মুক্তি পেলে।

জনতা যে হ্যান্ডবিল বিতরণ করল, তাতে লেখা হল,

"ছোট্ট শিশুকে বাঁচান। মানবতার হাত প্রসারিত করুন। শার্লি রসকে বাঁচানো আমাদের নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব থেকে আমরা সরে যেতে পারি না।"

সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল,

"শার্লি রসকে মুক্ত করে আনতে পারলে ২০ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে।"

একটা বিষয় কারো কাছেই পরিষ্কার নয়, শার্লি রসের অপহরণ রহস্য খোলসা হল না। এর কোন সমাধান হল না।

সাক্ষ্য প্রমাণে এটা পরিষ্কার, অপহরণকারীরা ক্রিশ্চিয়ান রসের লিখিত আবেদন ঠিকমত পড়েনি বা বুঝতে পারেনি। আর সে কারণেই সমঝোতার সব পথ বন্ধ হয়ে গেল।

ফিলাডেলফিয়া কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে নতুন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করল। তারা ব্যানারে লিখল,

"টাকা যোগাড় হয়েছে। অপহরণকারীরা, তোমরা শার্লি রসকে নিয়ে এস, এবং টাকা নিয়ে যাও। আমরা তোমাদের প্রতিনিধিকে চিনব কি করে?"

যৌক্তিকভাবে ব্যাংক এবং ফিলাডেলফিয়া নগর পর্ষদ কোনভাবেই অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছুক ছিল না। তাদের এ যোগাযোগ ছিল এক প্রকার মিথ্যা আশ্বাস। স্থানীয় পর্ষদ ও নেতৃবৃন্দ আশা করেছিল, অপহরণকারীরা তাদের এ আহ্বানে সাড়া দেবে। অবশ্য নিউ জার্সির ক্যামেডন থেকে তারা চিঠি পোস্ট করেছিল।

অপহরণকারীরা লিখল,

"রস, আপনি যে প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা করেছেন আমরা সেভাবেই কাজ করব। যদি মুক্তিপণের টাকা যোগাড় করে দিতে চান তাহলে সময়মত জানাব কোথায় এবং কার কাছে দিতে হবে। বিন্দুমাত্র সময় ক্ষেপণ করব না। আর একটা বিষয় বুঝতে পারছি উভয়ের মধ্যে কোন বিশ্বাস নেই। এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যখন কোন প্রতিনিধি পাঠাব তখন ঠিকই তাকে চিনতে পারবেন। সেও আপনাকে চিনবে।"

BanglaBook.org

২২ জুলাই। এইদিন সকালেই রস ঠিক করলেন যেভাবেই হোক অপহরণকারীদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তাদের সাথে সমঝোতায় পৌঁছবেন। তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। অপহরণকারীদের সাথে কোন প্রকার

যোগাযোগ করতে পারেননি। এর দু'দিন পর ২৪ জুলাই অপহরণকারীরা প্রতিনিধির মাধ্যমে চিঠি পাঠাল রসের কাছে।

তারা জানাল,

"এক সপ্তাহ দেরি হবে। চন্দ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল হয় না। তাই এ সময় কোন প্রকার আর্থিক লেন-দেন করি না।"

অপহরণকারীরা জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করে এবং তারা এর উপর এতটা নির্ভরশীল তা জানা ছিল না ক্রিশ্চিয়ান রসের। পুলিশের কাছেও বিষয়টা খটকা লাগল। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সাফল্যের আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তারা ভেবেছিল অপহরণকারীদের পক্ষ থেকে যেই মুক্তিপণের টাকা নিতে আসবে তাকে গ্রেফতার করবে। ভণ্ডুল হল সব আশা।

অপহরণকারীদের পক্ষ থেকে চিঠিতে লেখা হল,

"এ সময় ক্ষেপন আপনর জন্য খুবই মানসিক যন্ত্রণার বটে কিন্তু কিছুই করার নেই। চন্দ্রমাসের প্রথম পক্ষকাল পার না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করি না। কারণ এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ হয় না।"

অপহরণকারীরা ক্রিশ্চিয়ান রসের মনোভাব বুঝতে চাচ্ছিল। তারা অজান্তেই তা পাঠ করে ফেলল। কারণ তারা যখন জানতে পারল অপহরণকারীদের ধরে দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে তখনই নতুন কৌশল অবলম্বন করল।

পুরস্কার ঘোষণায় লেখা হয়েছিল,

"মুক্তিপণ বাবদ আমরা এ অর্থ দিচ্ছি না। এক পয়সাও এর জন্য ব্যয় করব না। কিন্তু মানবতার দৃষ্টিতে শত শত কোটি ডলার ব্যয় করতে প্রস্তুত।"

পাল্টা জবাব দিয়েছিল অপহরণকারীরা,

"আত্মরক্ষার জন্য শত শত কোটি ডলার ব্যয় করা যায়, কিন্তু একটি কাজের জন্য এক সেন্ট উৎসর্গ করা যায় না?"

উভয়ের মধ্যে বাগযুদ্ধের একটা সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছিল ক্রিশ্চিয়ান রসের পরিবার।

তাকে প্রশ্ন করেছিল অপহরণকারীরা,

"কেন আপনার পক্ষ হয়ে ব্যাংক এবং আর্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠান মুক্তিপণের জন্য ২০ হাজার ডলার পরিশোধ করছে না? বরং তারা ঘোষণা দিল অপহরণকারীদের ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেবে? কে আমাদের গ্রেফতার করবে? মানুষ নিশ্চয়ই এত বোকা নয়। আর পুলিশ বাহিনীর কর্মদক্ষতা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন।"

ফিলাডেলফিয়ার নগর পর্ষদ এবং গোয়েন্দা সংস্থার অবিরাম পরামর্শে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ান রস। যে যেভাবে পারছে, ক্রমাগত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে যেন কারও কোন ক্লান্তি নেই। অনেকেই প্রতিনিধিদের

BanglaBook.org

সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছিল। আর সাংবাদিক শ্রেণী পিছু লেগেই ছিল। ক্রিশ্চিয়ান রসের বাসায় সব শ্রেণীর মানুষ যাতায়াত করতে থাকে। বিভিন্ন পেশার মানুষ এসে তাদের খোঁজ-খবর নিতে থাকে। গীর্জার পাদরি থেকে শুরু করে সমাজ সেবক, রাজনীতিবীদ, সাধারণ মানুষ, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব সবাই তাকে স্বান্ত্বনা দিতে থাকে। তারা সহানুভূতি প্রকাশ করে। প্রত্যেকে যেভাবেই হোক শার্লি রসের মুক্তির জন্য অর্থ সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছিল। সমস্যা হচ্ছে সংবাদপত্র জগত নিয়ে। তারা প্রচার করবে কোন বিশিষ্ট শিল্পপতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে। এতে করে অপহরণকারীরা সেই ব্যবসায়ীকেও পাকড়াও করতে পারে। জন্ম নেবে হলুদ সাংবাদিকতার। সারা দেশজুড়ে নানা কল্পকাহিনী ছড়িয়ে পড়বে। এমনও হতে পারে, ব্যবসায়ীর চরিত্র ভুলুণ্ঠিত করে বাজে সব কল্পকাহিনী ছাপিয়ে দিতে পারে। এর পরিণতি হবে আরো ভয়াবহ। পত্র পত্রিকায় শিরোনাম হবেন মিষ্টার এবং মিসেস রস। এতে করে ওয়াল্টার রসের মানসিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে। সে হয়তো অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়তে পারে। পত্র পত্রিকা ইতিমধ্যেই একটা অনৈতিক কাজ করে বসল।

তারা সংবাদ প্রকাশ করল,

"ক্রিশ্চিয়ান রসের টাকার প্রয়োজন।"

পত্রিকায় লেখা হল,

"রসের সম্পত্তির উপর শার্লিকে ভস্মিভূত করা হল।"

এ ঘটনা জানতে পেরে ক্রিশ্চিয়ান রসকে ফিলাডেলফিয়ার মেয়র স্কেলটন জেরা করলেন,

"কেন তিনি ব্যাংক এবং আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছেন।"

এ প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না ক্রিশ্চিয়ান রস। বরং যে পত্রিকা এসব কল্পিত কাহিনী প্রকাশ করেছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করলেন। পত্রিকার জরিমানা হল কিন্তু প্রতিবেদকের কিছুই হল না। কোন প্রকার মামলায় তাকে জড়াতে হয়নি।

অপহরণকারীরা চন্দ্র মৌসুমে শুক্ল পক্ষের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেটা তারা আগেই অবহিত করেছিল ক্রিশ্চিয়ান রসকে। তারা এজন্য সব ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন স্থগিত রেখেছিল ৩০ জুলাই পর্যন্ত।

ক্রিশ্চিয়ান রসকে তারা চিঠি লিখে জানাল,

"৩০ জুলাইয়ের মধ্যে টাকা নিয়ে তৈরি থাকতে। তার বাসায় প্রতিনিধি পাঠান হবে। ফলে তার বাসায় যে আগন্তুক যাবে তার কাছে টাকা দিতে হবে।"

BanglaBook.org

দুর্ভাগ্যজনক বশত: ৩০ জুলাই রসের বাসায় কোন আগন্তুক আসেনি। বরং তার কাছে একটি নির্দেশ এল। আসলে অপহরণকারীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত কাজ করে। কোন ফাঁদে জড়াতে চায়নি তারা।

তারা নির্দেশ দিল,

"রস আপনি ট্রেনে করে বিকালে নিউইয়র্কে চলে যান। সেখান থেকে অ্যালবেলির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। নিউইয়র্ক থেকে অ্যালবেলি এ পথের মধ্যে কোথাও সংকেত প্রদান করা হবে। যদি দিনের বেলায় রওয়ানা হন তাহলে ঘণ্টা এবং সাদা পতাকা উড়ান হবে আর রাতে হলে টর্চ এবং পতাকা থাকবে। তাকে ট্রেনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে নির্দেশ দেয়া হল। সেখানেই তার সাথে সাক্ষাত হবে। সিগন্যাল দেখা মাত্র আপনি, মুক্তিপণের টাকার ব্রিফকেস সে ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে দিবেন। কিন্তু ট্রেন যদি থেমে যায় এবং নির্দেশক যদি গ্রেফতার হয় তাহলে মনে রাখবেন আপনার সন্তানের পরিণতি হবে নির্মম।"

এখানেও দুর্ভাগ্য ক্রিশ্চিয়ান রসের। অ্যালবেলিতে পৌঁছানোর পর তিনি কাউকে দেখতে পাননি বরং সেখানকার ডাকঘরে গিয়ে তিনি একটি চিঠি পেলেন।

চিঠিতে লেখা হল,

"আপনি আরো এগিয়ে যান। যাত্রা চলতে থাকুক। আরো সামনে অগ্রসর হন।"

এ চিঠিটা আগের সবগুলো থেকে ব্যতিক্রম মনে হল ক্রিশ্চিয়ান রসের কাছে। সমঝোতার কোন আভাষ নেই এ চিঠিতে, কোথায় কার সাথে দেখা হবে, কিভাবে হবে কিছুই উল্লেখ নেই। অতীতে রস যে ভুল করেছিল, সে ব্যাপারে কোন কথা নেই। বরং চিঠিটা পড়ে তার কাছে মনে হল এটা চরমপত্র।

রসকে লেখা হল,

"আপনার সন্তানের মুক্তির সব আশা শেষ।"

অপহরণকারীদের পক্ষ থেকে তাকে অ্যালবেলি থেকে আরো সামনে যে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেয়া হল সেদিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। তার চাচাত ভাই সাথে থাকবে। এবার তিনি অপহরণকারীদের দাবীকৃত টাকা নেবে না। হাতে থাকবে শুধুই চিঠি। তার এসব কাজের নির্দেশনা ঠিক করে দিল ফিলাডেলফিয়ার স্থানীয় পর্ষদ। কাজের তালিকা তৈরি করে দেয়া হল। তালিকায় সই করলেন রস।

নির্দেশনায় লেখা ছিল,

"অপহরণকারীরা, তোমাদের কথা মত আমি বাগানে ২০ হাজার ডলারের ব্রিফকেস ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি না। এক হাতে তোমরা টাকা নেবে আরেক হাতে সন্তাকে ফিরিয়ে দেবে।"

BanglaBook.org

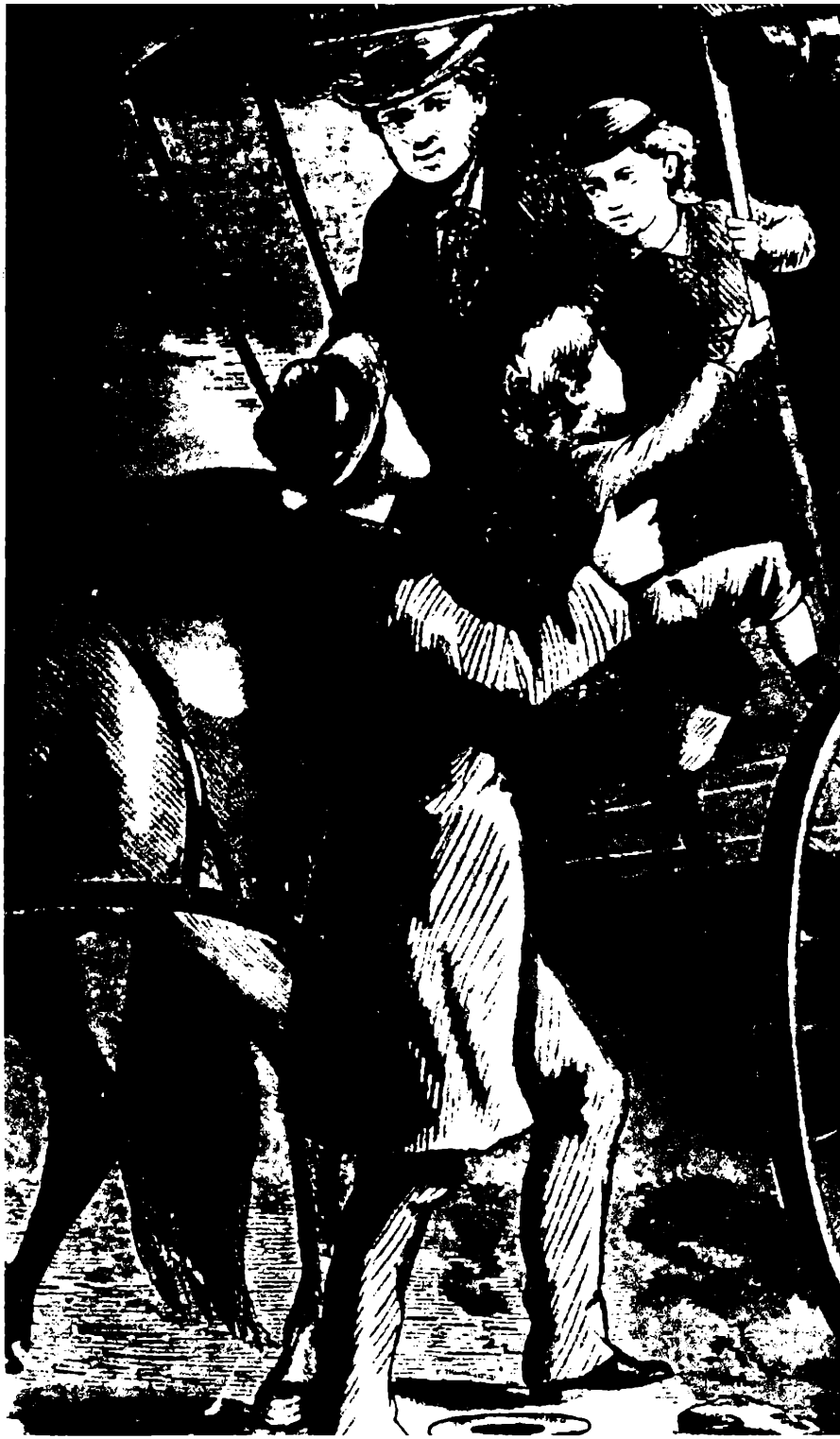

শার্লি রসকে অপহরণ করে তাকে জোরপূর্বক ঘোড়ার গাড়িতে তোলা হচ্ছে

নানা চিন্তা ভাবনা করছিলেন রস। তার সাথেই ছিল ড্যানিস। ফিলাডেলফিয়া থেকে তারা ট্রেনে উঠল। নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হল। জানালার পাশে বসেছিলেন তিনি। ট্রেনের প্রতিটি সিগন্যাল তিনি গভীর দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। তাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং কেমন মানুষের সাথে সাক্ষাত হবে সেজন্য সে ধরনের মানুষ দেখা যায় কিনা, তা লক্ষ্য করছিলেন। দুর্ভাগ্যজনক ঘণ্টা ও সাদা পতাকা নিয়ে কেউই দাঁড়িয়ে নেই। গোয়েন্দা বাহিনী তাকে নিউইয়র্কের গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল রেল স্টেশন থেকে আরেকটি ট্রেনে তুলে দিল। সে-ই ট্রেন অ্যালবেলির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তখন রাত অনেক হয়ে গেছে। রসের মনে পড়ল, রাতের বেলায় নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, হাতে টর্চ এবং পতাকা থাকবে। না, কারো হাতে কোন টর্চ নেই। কেউ পতাকা নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে না। অ্যালবেলিতেও কাউকে তিনি পেলেন না। হতভম্ব হয়ে গেলেন রস। কোন উপায় না দেখে তিনি অ্যালবেলিতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবারও পোস্ট অফিসে গেলেন। সম্ভবত, অপহরণকারীরা নতুন করে কোন নির্দেশনা দিতে দেরি করছে। তারা আর কোন চিঠি দেয়নি। রস ভাবছিলেন, তাহলে কোথায়ও কি কোন ভুল হল? অপহরণকারীরা কি তাদের পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন ঘটিয়েছে? তারা নিজেরাও কি কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়েছে?

অপহরণকারীরা তাদের প্রতিনিধি না পাঠানোর ব্যাখ্যা করল। তারা রসের কাছে চিঠি লিখল। রসের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চিঠি পাঠাল, কিন্তু তখন প্রতিষ্ঠানে ছিলেন না রস। এর মধ্যে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটল।

৩০ জুলাই পত্রিকায় লেখা হল,

"শার্লি রসকে হামবুর্গ শহরে দেখা গেছে।"

ফিলাডেলফিয়া থেকে হামবুর্গ ৭৫ মাইল উত্তরে।

পত্রিকায় আরো লেখা হল,

"ক্রিশ্চিয়ান রস হামবুর্গে গিয়ে তার ছেলেকে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন।"

অপহরণকারীদের পক্ষ থেকে ক্রিশ্চিয়ান রসকে সর্বশেষ জানান হল,

"তারা কোন প্রকার মায়ার মধ্যে রাখেনি তাকে। যেটা তারা করেছিল শার্লির প্রতি।"

তারা শার্লি রসকে ছেলে ভুলানো গল্প শুনিয়ে অপহরণের কাজটি সমাধা করেছিল। ফলে তারাই পারে শার্লিকে ফিরিয়ে দিতে। স্বাভাবিকভাবেই অপহরণকারীরা তাদের প্রতিনিধিকে রসের কাছে পাঠায়নি। বরং তারা সর্বশেষ একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিল। তার একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা

BanglaBook.org

জানত জন। তার ঠিকানাও জানা ছিল জনের। তার মাধ্যমেই যোগাযোগ করেছিল অপহরণকারীরা।

২ আগস্ট, শার্লি রস অপহরণের বত্রিশ দিন পার হল। শার্লি রসের অনুসন্ধান পুনরায় শুরু হল।

ক্রিশ্চিয়ান রস তার বাড়ির সামনে বিশাল ব্যানারে লিখলেন,

"অপহরণকারীরা, তোমাদের নির্দেশ মত কাজ হয়েছে। তোমরা যেভাবে অনুসরণ করে পথ চলতে নির্দেশ দিয়েছিলে, সেভাবেই করা হয়েছিল। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস এবং আস্থা কোনটাই রাখতে পারনি। যেখানে যেতে বলেছিলে এবং কার সাথে দেখা হবে, সে কোন ধরনের সিগন্যাল দেবে তার কোনটাই হয়নি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ। কোন চিঠিও পাইনি। কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ হয়নি।"

পরেরদিন অপহরণকারীরা চিঠির মাধ্যমে তাদের ভুল স্বীকার করল। তারা রসকে মুক্তিপণের টাকা ডাকঘরে রেখে আসতে বলল। অপহরণকারীরা ওয়াদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল।

তারা আরো জানাল,

"যে প্রতিনিধি পাঠাবে তার মাধ্যমে দাবীকৃত টাকা পেলেই আপনিও সন্তান ফিরে পাবেন।"

অপহরণকারীদের সাথে অবিরাম সমঝোতায় কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই আর তা হচ্ছে, তাদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়া। এটাও এক ধরনের কৌশল বটে। এদিকে ফিলাডেলফিয়া স্থানীয় পর্ষদ, পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ কঠোর সিদ্ধান্ত নিল। তারা একমুখী নীতি অবলম্বন করল। এটা বুঝতে পারল, সহজ পথে সমাধান অসম্ভব। অ্যাকশনে যেতে হবে। অপহরণকারীদের বিরুদ্ধেযুদ্ধ ছাড়া সমাধান হবে না।

৪ আগস্ট, অপহরণকারীরা চিঠিতে জানাল,

"আমরা আর কোন যোগাযোগ করব না। যতক্ষণ না আমাদের শর্ত পূরণ করছেন ততক্ষণ আর নতুন কোন আলোচনা নেই। আমরা একটাই পথ বেছে নিয়েছি। রস, আপনার যদি কিছু বলার থাকে আপনি নিউইয়র্ক হেরাল্ডের কাছে তা জানিয়ে দিবেন। আমরা সেখান থেকেই আপনার কথা জানতে পারব।"

বাস্তবিক অর্থে পুলিশ যেমন কঠোর পথ অনুসরণ করছিল একইভাবে, যোগাযোগ রক্ষা করে কঠোর অবস্থান নিল অপহরণকারীরা। কিন্তু পুলিশ যতটা হম্বিতম্বি করল কাজে কর্মে তার লেশমাত্র দেখা যায়নি। পুলিশ বিভাগ পরবর্তী তিন সপ্তাহ সর্ব প্রকার নির্দেশ এড়িয়ে গেল। এ সময়ে উভয় পক্ষই নিজেদের

BanglaBook.org

অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করল। ফলে কেউ সাথে কোন যোগাযোগ করল না।

এভাবেই সেকেন্ড, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর পার হচ্ছিল। হঠাৎ করেই অপহরণ নাটক নতুন মোড় নিল।

সেপ্টেম্বরের কোন এক সন্ধ্যায় ঘোড়ার গাড়ি চোর জিন মোশেরে অভিযোগ করলেন,

"তার ৫২ বছরের ভাই, উইলিয়াম এ অপহরণের সাথে জড়িত।"

সে এ কাহিনী নিউইয়র্কের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট জর্জ ওয়ালিংকে সব খুলে বলল।

সে জানাল,

"তার ভাই বিলকে একবার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, কমোডর ভ্যান্ডারবিলের নাতনিকে অপহরণ করতে হবে। তারা প্রথমে ঠিক করতে পারেনি শার্লি না ওয়াল্টার রসকে অপহরণ করবে। এ কাজের ব্যাপারে সঠিকভাবে জানতে, সে বিলের তরুণ সহযোগী জো ডগলাসের কাছে গিয়েছিল।"

এ কথার প্রমাণ স্বরূপ বিলের লেখা চিঠি প্রদর্শন করল সে। পুলিশ চিঠি দেখেই বুঝতে পারল এ লেখা বিলের। মুক্তিপণের টাকা প্রদানের জন্য ক্রিশ্চিয়ান রসের কাছে যে চিঠি লেখা হত, তার সাথে এ লেখা মিলে যায়।

এ পয়েন্টেই পুলিশ স্থির হল।

পুলিশ বলল,

"বিল মোশের এবং জো ডগলাসকে তারা খুঁজছে।"

সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে জিন মোশের কৃতিত্ব পাওয়া উচিত। কিন্তু তাকে কৃতিত্ব দিতে কুণ্ঠা বোধ করল পুলিশ বিভাগ। কারণ তারা জানত জিন মোশের, তার ভাইয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। এ প্রতিশোধের অন্যতম কারণ হচ্ছে, দস্যুবৃত্তি করে সে যে অর্থ উপার্জন করেছিল সেক্ষেত্র ভাগ বাটোয়ারাতে প্রতারণা ও ফাঁকি দিয়েছে। আর সে কারণেই ভাইয়ের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিশোধ নিতেই পুলিশকে এসব তথ্য জানিয়েছিল সে। জিন এতটাই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল, সরকার ঘোষিত পুরস্ককারের লোভে পুলিশকে সব জানিয়ে ছিল। তার দেয়া তথ্য, কোনমতেই অবিশ্বাস করা যায় না। বিন মোশেরকে অভিযুক্ত করা হল এ অপহরণের জন্য। তার ভাইয়ের বর্ণনার ভিত্তিতেই তাকে অপরাধী করা হল। নিউইয়র্কের গোয়েন্দা বিভাগ বহু বছর পূর্বে একটি সামাজিক অপরাধের জন্য বিন মোশেরকে গ্রেফতার করেছিল। তাদের একটি বিষয় স্মরণ হচ্ছে, অপরাধীর শারীরিক আকৃতি কিছুটা বিকৃত ধরনের। বিশেষ করে নাকটা সম্পূর্ণ বানরের মত। সে কথাটা বলেছিল শিশু ওয়াল্টার রস।

BanglaBook.org

পুলিশের মূল দায়িত্ব হল বিন মোশের এবং জো ডগলাসকে খুঁজে বের করা এবং তাদের গ্রেফতার করা। এটা জাতীয় দায়িত্বও বটে। নিউইয়র্ক পুলিশ এটাও ভালই জানে বিন মোশের খুবই দায়িত্ববান স্বামী এবং কর্তব্যপরায়ণ পিতা। পরিবারের লোকজনের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। স্ত্রী এবং সন্তানের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। পুলিশের তরফ থেকে তাকে খুঁজে বের করার নির্দেশ এল। বিনকে খুঁজে বের করতে হবে তার স্ত্রী মার্থা এবং চার সন্তানের জন্য। আর পুলিশের পক্ষে এটা খুবই সহজ, দাগী অপরাধীকে খুঁজে বের করার থেকেও তার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদের নজরে রাখা অতি সহজ।

পুরস্কারের লোভে জিন মোশের পুলিশকে আরো নতুন কিছু তথ্য দিল। সে জানাল,

"যে মার্থার ভাই উইলিয়াম ওয়েস্টারভেল্ট ছিলেন পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা। চাকরি থেকে তাকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, জুয়ার আসর থেকে নিয়মিত অর্থ আদায় করতেন। প্রচুর অবৈধ অর্থ উপার্জন করতেন। অপরাধীদের সাথে তার মেলামেশা ছিল। নিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা হয়েও ঘোড়ার গাড়ি চালাতেন তিনি। বিন মোশের সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। এ ঘোড়ার গাড়িতেই শিশু ওয়াল্টার রসকে ফিলাডেলফিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন তার পরিচর্যার জন্য। কিন্তু ঐ গাড়িতে ওয়াল্টার রস একাই ছিল না, সাথে ছিল শার্লি রসও। বাসায় ফিরে এসেছিল ওয়াল্টার রস কিন্তু শার্লি রস আর ফিরে আসেনি।"

ওয়েস্টারভেল্ট সব সময় নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করতেন, যেন তাকে কেউ যেন কোন সন্দেহ না করে এবং তার বিরুদ্ধে সহজেই কেউই কোন অভিযোগ দাঁড় করত না। এজন্য যতটা সম্ভব পুলিশের সন্দেহ হয় এমন কাজ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। হিসাব কষে পা ফেলতেন তিনি। সবদিকে ভেবে চিন্তে তারপরই অপরাধ কর্মে জড়াতেন। ওয়েস্টারভেল্টকে না জানিয়ে বা এড়িয়ে কিছু করতে চেষ্টা করত বিন মোশের।

শার্লি রসের অপহরণের গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য-প্রমাণ পুলিশের হাতের কাছে যেন এসে পড়ল। পুলিশ বুঝতে পারল, শার্লি রসের অপহরণের সাথে ওয়েস্টার ভেল্টের যোগসূত্র রয়েছে, সেটাই এখন প্রমাণ করা জরুরী। একেক সময়ে তার কর্মকাণ্ড বেশ সন্দেহজনক ছিল। বিভিন্ন সময়ে সে তার শালির বাড়িতে বেড়াতে আসত। কিন্তু কেন আসত, সেটাই অজানা ছিল। কোন কারণ জানা যায়নি। আশপাশে লক্ষ্য রাখত। কিছুদিন ঘুরে বেড়াত। তারপর আবার ফিরে যেত পুলিশের খাতায় সে ভয়াবহ দাগী আসামী। দীর্ঘ এক মাস যাবত নিউইয়র্কের পুলিশ বিভাগের মধ্যে এ ধারণা জন্মাল, ওয়েস্টারভেল্ট তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে

ফেলেছে এবং পরিচালিত করছে। তার প্রতি বিশেষ নজর রাখার অর্থ একটাই, পুলিশ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন গ্রেফতার হন, তার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। তিনি অপহরণের ব্যাপারে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অপহরণের কাহিনী নিজের মত করেই বর্ণনা করলেন ওয়েস্টারভেল্ট। যা হোক, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠাল। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাল। শুনানী হল। রিমান্ডের আবেদন করেছিল পুলিশ। বিচার বিভাগ থেকে রিমান্ড মুঞ্জুর করা হল। পুরো বিষয়টি গোপন রাখা হল। এমনকি ক্রিশ্চিয়ান রসও এ ঘটনা জানতে পারেনি। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ কিভাবে কাজ করছিল তা কখনো জানতে পারেনি ক্রিশ্চিয়ান রস। সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল । তাকে শুধু এই নির্দেশ দেয়া হল, শার্লি রসের অপহরণকারীরা কোন তথ্য দিলে, তিনি যেন সাথে সাথে পুলিশকে অবহিত করেন। তাহলে শার্লি রসকে মুক্ত করা সহজ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ লক্ষ লক্ষ কপি বাজারে প্রচার করল। অপহরণকারীদের নাম ছড়িয়ে পড়ল প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে। ঘটনা যা দাঁড়াল তা হচ্ছে এতদিন ফিলাডেলফিয়া আর নিউইয়র্কবাসী এ অপহরণের খবর জানত, এখন প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের পুলিশ বিভাগের নজরে এসে পড়ল। শুধু তাই নয়, এ অপহরণ কাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে কানাডা এবং কিউবাতে ছড়িয়ে পড়ল।

নিউইয়র্ক পুলিশ তাদের গোয়েন্দা কাজে কতটা অগ্রসর হয়েছিল তা ফিলাডেলফিয়ার কর্তৃপক্ষকে অবহিত করল। ফিলাডেলফিয়ার পুলিশ এ তথ্য ক্রিশ্চিয়ান রসকে জানাল। এটা তারা কর্তব্য বলেই মনে করল। এটা করা হয়েছিল এ জন্যই যে পুলিশের কাজে কর্মে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ান রস তা দূর করতেই তাকে পুলিশ বিভাগ এ তথ্য জানাল। তারা যে ওয়েস্টারভেল্টের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এগুচ্ছে সেটাও জানান হল। নিউইয়র্কের প্রধান এসপি জর্জ ওয়ালিং ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওয়েস্টারভেল্টের সাথে সাক্ষাত করেন। তারা দু'জন, নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিল যেভাবেই হোক অপহরণকারীদের সাথে সাক্ষাত করবেন। সেটাই করেছিল তারা অপহরণকারীদের খুব কাছে চলে এসেছিল তারা। যে ইনফর্মারের মাধ্যমে তাঁরা অপহরণকারীদের সাথে যোগাযোগ করেছিল ওয়েস্টারভেল্ট তাকে নগদ কিছু টাকা সাহায্য করতে চেয়েছিল। এতে ওয়ালিং বিরোধিতা করেনি। তার চিন্তা হচ্ছিল বিন মোশের বলবে, ওয়েস্টারভেল্ট এসপি হতে চেয়েছিল। ঘোড়ার গাড়ির চাকরির থেকে পূর্ণ সময়ে পুলিশের দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল পুনরায় হয়ত চাকরি যেন ফিরে পায়। ওয়েস্টারভেল্টের তৃতীয় শর্ত ছিল পুলিশের সাথে তার এ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তা যেন গোপন থাকে।

ওয়েস্টারভেল্টের সব শর্ত নীতিগতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করল জর্জ ওয়ালিং। ঘোড়ার গাড়ির মালিক এবং পুলিশের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে জর্জ ওয়ালিংয়ের কাছে তথ্য জানতে চাইল তখনই ওয়েস্টারভেল্ট তাকে চাপ দিতে থাকে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছায় উভয়পক্ষই আবেগে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সে কখনোই চায়নি তার শালার উপর পুলিশের যেন কোন চাপ না থাকে। এতে করে তার স্ত্রীর মানিসক অবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। স্ত্রী অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করবে, সেটা চায়নি ওয়েস্টারভেল্ট। এ বিষয়টি এসপি জর্জ ওয়ালিং অনুধাবন করলেন। একটা বিষয় ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন জর্জ ওয়ালিং। তিনি ভাবছিলেন, ওয়েস্টারভেল্টের পক্ষে কি বিন মোশের বিরোধীতা করা সম্ভব? তার এ বিরোধিতার ফল কি হবে সেটা কি জানেনা ওয়েস্টারভেল্ট? জর্জ ওয়ালিং ভাবছিলেন, এতে রক্তপাত না হয়। আর একটি বিষয় পরিষ্কার ছিল, ওয়েস্টারভেল্টের দাবী-দাওয়া পূরণ হত ডগলাসের মাধ্যমে।

ডগলাসের উপর কমিশনের ব্যাপারে নির্ভর করতেন ওয়েস্টারভেল্ট। কমিশন নির্ধারণ করতেন এসপি জর্জ ওয়ালিং। তাদের মধ্যে সব ধরনের বোঝাপড়া এবং সমঝোতা চলত ঠিকমতই। দু'জনেই ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং প্রখর। কে কাকে শিশু ও নির্বোধ ভাবত তাই বুঝা দুষ্কর ছিল। পুলিশ যদি মনে করে থাকে, অপহরণকারীদের সম্পর্কে যিনি তথ্য দিয়েছেন, তিনি এতটাই, বোকা যে ডগলাস পরিচালনা করছে বিন মোশেরকে তাহলে তার মত বোকা আর কেউ নেই। সেটা হবে পুলিশের জন্য ভুল ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাও এক ধরনের গেম। এ পরিকল্পিত খেলায় বিন মোশের অজ্ঞ। জর্জ ওয়ালিং বুঝতে পেরেছিলেন তার কৌশলে কাজে হিচ্ছল। বিন মোশেরকে অনেকটা আয়ত্বে এনে ফেলেছিলেন তিনি।

ইনফর্মার অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তার শালা তার প্রতি আস্থা রাখতে পেরেছিল এ ভেবে। কিন্তু একথা তার জানা ছিল না, এবং কখনই শোনেনি, ওয়েস্টারভেল্ট কোন বাচ্চাকে বিশেষ করে শার্লি রসকে অপহরণ করবে। বরং বিন মোশের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল ওয়েস্টারভেল্টের পক্ষে শিশু অপহরণ করা অসম্ভব। পুলিশ যখন তাদেরকে অপহরণের কথা বলল, তখন তারা যেন আকাশ থেকে পড়ল। এ ধরনের অপকর্মের কথা তারা আগে কখনও শুনেনি। ওয়েস্টারভেল্ট একেবারে সুন্দর মত পাল্টে গেল। সে ভিন্ন সুরে কথা বলতে থাকে। এমন মনোভাব প্রদর্শন করল, সে এ ধরনের ঘটনা এ বারই প্রথম শুনল। বরং শার্লি রস অপহরণের ঠিক এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ জুনে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তাই বলতে থাকে ওয়েস্টারভেল্ট। ঐ মাসে সে ঘোড়ার গাড়ি কিনেছিল, সেটাই দেখিয়েছিল বিন মোশেরকে। এদিকে জর্জ ওয়ালিং নিজস্ব

BanglaBook.org

পরিকল্পনার কথা তুলে ধরলেন। তিনি এ সময় নতুন তথ্য দিলেন, এ ঘোড়ার গাড়িতেই অপহরণ হয়েছিল শার্লি রস। সাক্ষ্য প্রমাণের সব দলিলপত্র তুলে ধরলেন। নথিপত্র নিখুঁতভাবে পড়ল ওয়েস্টারভেল্ট। নথিপত্রে বিন মোশেরকে দায়ী করা হয়েছিল। শুধু ছোট্ট একটু বর্ণনা বাদ দিয়েছিল। পুলিশের সাক্ষ্য প্রমাণ ও নথিপত্রে বিন মোশের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল। সব কিছুর উপরে যত অতীত অপকর্ম হয়েছিল তার মূলে ছিল ওয়েস্টারভেল্টের নাম। তার নাম সবার শীর্ষে থাকলেও সেটা বড় ধরনের অপরাধী হিসাবে নয়। ওয়েস্টারভেল্টের সাথে ওয়ালিংয়ের সর্বশেষ বৈঠক হয়েছিল যখন তিনি ছিলেন ফাঁড়ির সাধারণ কর্মকর্তা। এসপি নির্দেশ দিয়েছিল ওয়েস্টারভেল্টকে গ্রেফতার করতে। প্রধান কার্যালয় থেকেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। চাকরিচ্যুত করা হল ওয়েস্টারভেল্টকে। গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি জানতে পেরেছিলেন মার্থা মোশের কোথায় রয়েছে। সবকিছু জেনেছিলেন ইনফর্মারের মাধ্যমে। ওয়েস্টারভেল্ট কেন বহিষ্কৃত হয়েছিলেন সেটা ছিল পুলিশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নানা প্রকার অপরাধের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যা হোক ওয়েস্টারভেল্ট পুলিশকে শুধু বলল, "সে ডগলাসের খবর বলতে পারবে। কিন্তু তার ভগ্নিপতির সংবাদ দিতে পারবে না। এসপি জর্জ ওয়ালিং মানসিকভাবে আহত হল। সে এটা বুঝতে পারল ওয়েস্টারভেল্টের

সাথে কোন চুক্তি করলে কাজে সমস্যা হবে। পানি আর রক্তের মিশ্রণ এক হয় না। এ যেন এক যুদ্ধ। ওয়েস্টারভেল্টের কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য পেতে হলে তার নির্দেশ মতই চলতে হবে। জর্জ ওয়ালিং অত্যন্ত শান্ত মনে কাজ করতে হবে এটাই বুঝতে পারছিলেন। ওয়েস্টারভেল্ট সব ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করল। তার ইচ্ছার কথা জানাল। সে জানাল মোশের এবং ডগলাস গোপনে বৈঠক করেছিল। তারা সাধারণত সেলুনে বসে গল্প করত। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কখনো সে জানতে পারেনি। সব কিছু যখন চূড়ান্ত তখনই তাকে জানানো হয়েছিল। ওয়েস্টারভেল্ট তাদের সমর্থন করেছিল। এদিকে জর্জ ওয়ালিং ইনফর্মারের কাছ থেকে তথ্য জানার জন্য পুলিশের পরিচালনা পর্ষদের সভাকক্ষে বিশেষ সাক্ষাতের আয়োজন করেছিল।

ফিলাডেলফিয়াতে স্থানীয় নগর কমিটি নিয়মিত জর্জ ওয়ালিংয়ের প্রেরিত প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করছিল। তাদের এসব বৈঠকে শার্লি রসের মুক্তির ব্যাপারে বাস্তবিক অর্থে কোন বক্তব্য ছিল না। তারা যে বেশি অগ্রসর হতে পারেনি সেটা সহজেই অনুমেয়। মাসের পর মাস পার হয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সময় ক্ষেপণ করছিল। ক্রিশ্চিয়ান রস খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। অবস্থা এমন পর্যায়ে

BanglaBook.org

পৌঁছল, ক্রিশ্চিয়ান রস বিছানায় পড়ে গেলেন। এ অসুস্থতার কারণে একাজে দায়িত্ব নিল স্ত্রী সারাহ রস, তার ভাই হেনরি এবং জোসেফ লুইস। তারা শার্লি রসের মুক্তির ব্যাপারে সব চেষ্টাই চালাল। এসব দৃঢ় মনোবল মানুষগুলি ফিলাডেলফিয়ার কমিটির সাথে আলোচনা করতে সম্মত হল এবং সার্বিক সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। ফিলাডেলফিয়ার কমিটির সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল শার্লিকে কিভাবে মুক্ত করে আনা যায়। কমিটি পরিষ্কার জানিয়ে দিল, অপহরণকারীদের দাবীকৃত মুক্তিপণের টাকা দেয়া হবে না।

অপহরণকারীরা যেন অস্থির হয়ে উঠল। ক্রিশ্চিয়ান রসের কাছে ২৫ সেপ্টেম্বর চিঠি দিল।

তারা লিখল,

"তুমি যদি আমাদের অবহেলা কর তাহলে তোমার সন্তানের মৃত্যু নিশ্চিত। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার লাশ পাবে।"

এ চিঠি পড়ল জোসেফ লুইস। সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিল। চিঠির জাবাব দিল তারা। অপহরণকারীদের সব শর্ত মেনে নিল। মানসিকভাবেই তাদের কথা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এ চিঠির পর ফিলাডেলফিয়ার কর্তৃপক্ষ যেন চুপ করে বসে থাকতে পারল না। সেটা সম্ভবও ছিল না। তারা তাদের সিদ্ধান্ত থেকে এক চুল না নড়ার সিদ্ধান্ত নিল। তাহলে শার্লি রসের মৃত্যুই চাচ্ছে ফিলাডেলফিয়া কর্তৃপক্ষ। এ জটিলতার মধ্যে থাকার আর সময় নেই। হেনরি এবং জোসেফ লুইস দু'ভাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল ফিলাডেলফিয়ার নগর পর্ষদের সাথে আলোচনা না করেই বরং যা কিছু করার নিজেরাই করবে। অপহরণকারীদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করল।

ফিলাডেলফিয়া কর্তৃপক্ষ যে মনোভাব পোষণ করেছিল তাতে বিন্দুমাত্রই খুশি হতে পারেননি হেনরি এবং জোসেফ। এমনকি জর্জ ওয়ালিংয়ের প্রতিবেদনে কোন আশার আলো দেখতে পায়নি তারা। ওয়ালিংয়ের আশা যেন হিম ঘরে আশ্রয় নিল। এ মুহূর্তে সবকিছু নির্ভর করছে ওয়েস্টারভেল্টের উপর। কিন্তু তিনিও কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি নিজেও তার মধ্যে ছিলেন না। এদিকে আরেকটি প্রতিবেদন ভাবিয়ে তুলল পুলিশকে।

সেলুনের কর্মচারী জানাল,

"দু'জন সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিয়মিত তার সেলুনে আসত। ওয়েস্টারভেল্টের সাথে তাদের কথা-বার্তা হত।"

জর্জ ওয়ালিং নিশ্চিত হলেন দু'সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে ওয়েস্টারভেল্টের নিয়মিত যোগাযোগ হত। এই দু' সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলেই সব

তথ্য বেরিয়ে আসবে। ইনফর্মার সে তথ্যই জানাল। পুলিশের অধীনস্থ ইনফর্মারও ওয়েস্টারভেল্টের সাথে ঐ দু' সন্দেহভাজন ব্যক্তির বৈঠকের খবর জানাতে পারেনি কারণ তাদের বৈঠক হত খুব স্বল্প সময়ের জন্য। পুলিশকে জানানোর সময় পায়নি সে। তার আগেই তারা চলে গেছে। ইনফর্মার কথা দিল এবং প্রতিজ্ঞা করল যদি তাদের সে দেখে তাহলে চিনতে পারবে। সেজন্য জর্জ ওয়ালিংকে দ্রুত ঐ দু' সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করতে বলেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। কি করা যায় তাই ভাবছিলেন জর্জ ওয়ালিং।

৩১ অক্টোবর। লুইস ভ্রাতৃদ্বয় অপহরণকারীদের কাছ থেকে চূড়ান্তপত্র পেল। সেখানেই নির্দেশিকা দেয়া আছে। তারা জানিয়ে দিল নিউইয়র্কে ২০ হাজার ডলার নিয়ে আসতে। কোন হোটেলে তাকে থাকতো হবে তা সময়মতই জানানো হবে। যতক্ষণ অপহরণকারীদের পক্ষ থেকে কেউ টাকা নিতে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সেখানে থাকতে হবে। অপহরণকারীদের প্রতিনিধি নির্দিষ্ট সময়েই আসবে। মুক্তিপণ বাবদ টাকা পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে শার্লি রস মুক্তি পাবে। সে যে মুক্তি পাবে সেজন্য তার পিঠে চিহ্ন আঁকা থাকবে।

ফিলাডেলফিয়ার স্থানীয় পর্ষদ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই লুইস ভ্রাতৃদ্বয় অপহরণকারীদের নির্দেশ মত ২০ হাজার ডলার নিয়ে নিউইয়র্ক হোটেলে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। তারা কোনভাবেই অপহরণকারীদের দেয়া নির্দেশ অমান্য করতে চায়নি। বরং যেভাবেই হোক শর্ত মেনে নিয়ে দাবীকৃত ২০ হাজার ডলার দিতে তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার এ সিদ্ধান্ত নিতে লুইস ভ্রাতৃদ্বয়ের তিন সপ্তাহ সময় লেগেছিল। কারণ ফিলাডেলফিয়ার নগর পর্ষদ কমিটির বিরুদ্ধে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করতেই এ দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়। এক পর্যায়ে কমিটির বিরোধিতা করে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মুক্তিপণের টাকা নিয়ে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং নিউইয়র্কে রওনা হওয়া তাদের জন্য সুফল হল না। তারা শেষ পর্যন্ত কমিটির সাথে সমঝোতা করল। ফিলাডেলফিয়া কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র কালক্ষেপন না করে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগকে জানিয়ে দিল।

লুইস ভ্রাতৃদ্বয় নিউইয়র্কের ফিফথ অ্যাভিনিউ হোটেলে অবস্থা নেয়। তাদের হাতে রয়েছে ২০ হাজার ডলার। এ টাকা তারা অপহরণকারীদের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেবে। তারা হোটেলে পৌছল ১৪ নভেম্বর। অপহরণকারীদের নির্দেশ মত তারা হোটেলে অবস্থান করল। অপেক্ষা করছিল অপহরণকারীদের প্রতিনিধি আসবে। কিন্তু ঐ দিন এবং পরের দিনও কেউ এল না। অপেক্ষা করছে লুইস ভ্রাতৃদ্বয়। কেউই এসে বলেনি, আমরা অপহরণকারীদের প্রতিনিধি এবং মুক্তিপণের টাকা আমাদেরকে দাও। খুবই হতাশ হল দু'ভাই। তাদের মনে

BanglaBook.org

হল ফিলাডেলফিয়া কর্তৃপক্ষই সঠিক ছিল। অপহরণকারীদের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করতে নিষেধ করেছিল তারা।

ফিলাডেলফিয়া স্থানীয় পর্ষদ তাদেরকে একথাও বলেছিল,

"অপরাধী গোষ্ঠীর সাথে কখনোই স্বচ্ছভাবে চুক্তি হয় না। তারা কোন ন্যায়-নীতি আদর্শ মানে না।"

এসব ভেবে কোন উপায়ান্তর না পেয়ে লুইস ভ্রাতৃদ্বয় আবার ফিলাডেলফিয়াতে ফিরে গেল। তারা জানত না, ফিলাডেলফিয়া কর্তৃপক্ষ নিউইয়র্ক পুলিশ কর্তৃপক্ষকে ঘটনা অবহিত করেছিল। আর সে কারণেই নিউইয়র্কের এসপি জর্জ ওয়ালিং ফিফথ এ্যাভিনুয়ের হোটেলের চারপাশে এক ডজনের বেশি গোয়েন্দা নিযুক্ত করল। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা হোটেলের চারপাশে নজর রাখল। তারা একটা বিষয় লক্ষ্য রাখছিল হোটেলে ব্রিফকেস নিয়ে কেউ আসা যাওয়া করে কিনা। অপরিচিত কোন ব্যক্তি হলেই, প্রথমেই সন্দেহভাজনের তালিকায় এনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। অপহরণকারীদের পক্ষে কেউই সেই হোটেলে আসেনি।

ফিলাডেলফিয়াতে ফিরে এসে স্থানীয় পর্ষদের সাথে বৈঠক করে লুইস ভ্রাতৃদ্বয় সিদ্ধান্ত নিল নিউইয়র্ক হেরাল্ডে চিঠি প্রকাশ করবে। তারা ১৯ নভেম্বর বিজ্ঞাপন দিল। তাতে লিখল,

"আমরা আমাদের কথা রেখেছি। মুক্তিপণের টাকা নিয়ে তোমরা নিউইয়র্কে যেতে বলেছিলে। তাই করেছি। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ। কোন কথা রাখনি। তোমাদের কথামত শূন্যের উপর ভর করে চলতে পারি না। তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরাও প্রস্তুত।"

ক্রিশ্চিয়ান রসের পরিবার এ প্রথম অপহরণকারীদের কড়া ভাষায় চিঠি লিখল। তবে সেটা কোনভাবেই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি। তারাও এ বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর উত্তরের অপেক্ষায় থাকল। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে যেটা আশা করা যায় সেটা হচ্ছে উত্তর দ্রুতই পাবে। বিস্ময়কর ব্যাপার দ্রুত কোন উত্তর এল না। কখনই কোন উত্তর তারা দেয়নি।

এদিকে ফিলাডেলফিয়ার স্থানীয় পর্ষদ মোশের এবং ডগলাসকে খবর দিন এ দু'জন গ্রীষ্মকালীন অবকাশ উদযাপন করতে নিজের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এদের জেরা করার ফলে পত্র-পত্রিকা, পুলিশ এবং সাধারণ মানুষও বলতে শুরু করে,

"দ্বিমুখী বিচার হয়েছে।"

বাড়ি ভেঙ্গে যারা প্রবেশ করেছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল ভ্যান ব্রান্ট এবং তার সতীর্থরা। শার্লি রসকে অপহরণের সুযোগ তারাই করে

দিয়েছিল। তাদেরকে শাস্তি দেয়া হল। এদিকে বিন মোশের স্ত্রী ছাড়া আর কেউই সন্দেহ করেনি, সে শার্লি রসকে অপহরণের সাথে সে জড়িত থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত এ ঝামেলা থেকে মুক্তি পেল সে। যেভাবে বিচার প্রক্রিয়া হল তাতে এর কর্মকাণ্ড যথেষ্ট সন্দেহের জন্ম নিল। শার্লি রসের অপহরণ কাহিনী ভিন্নখাতে প্রবাহিত করল বিচার বিভাগ। এতে ক্ষতি যা হওয়ার ক্রিশ্চিয়ান রসের পরিবারেরই হল। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় বিল মোশের এবং ডগলাস ইতোপূর্বে কখনোই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ায়নি। নিজেদের প্রতিরোধ করার কোন পদক্ষেপ নেয়নি তারা।

পুলিশের আচরণ এবং কর্মকাণ্ড ছিল খুবই সন্দেহজনক। তারা কি সত্যিই অপহরণকারীদের গ্রেফতারের চেষ্টা করেছিল। শুধুমাত্র অপহরণকারীদের খোঁজ করা ছাড়া সব কাজই করছিল তারা। প্রথমে যে কারণটি অনুসন্ধান করল তা হচ্ছে শার্লি রসকে বাসা থেকে কে তুলে নিয়ে গিয়েছিল? তাতে দেখা যায় অপহরণকারীদের ভয়ে হোক অথবা স্বেচ্ছায় হোক এ কাজ করেছিল বিল মোশের এবং তার সতীর্থরা। পুলিশের ধারণা ছিল খ্রীষ্টীয় বড় দিনের উৎসবে শার্লি রস বাড়ি ফির কিন্তু তা ঘটেনি। নতুন বছরের সূচনা হল কিন্তু শার্লির বাসায় আগমনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পুলিশ গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। তাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা ব্যাপকভাবে লিখতে থাকে।

রাস্তা-ঘাটে সকাল সন্ধ্যা মানুষজন পুলিশের ব্যর্থতার কাহিনী বলাবলি করতে থাকে। প্রত্যেকের বক্তব্য একটাই,

"পুলিশের সাফল্য শূন্যের কোঠায়। ব্যর্থতা পাহাড় সম। অপহরণকারীদের খুঁজে বের করা। তাঁদের গ্রেফতার করা এসব প্রচেষ্টাই পুলিশের ব্যর্থ হতে চলেছে পর্যায়ক্রমে। তারা যেটুকু চেষ্টা করেছিল সেটুকুও সফল হতে পারত না যদি মোশের এবং ডগলাস জীবিত না থাকত। অবশ্য তাদের কাছ থেকে খুব বেশি তথ্য পেয়েছে তা বলা যায় না। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ছিল ব্যাপক প্রশ্ন।"

এসপি জর্জ ওয়ালিং বিনা কারণেই সময় নষ্ট করছিলেন। তিনি এমন সব বিষয় উত্থাপন করছিল যা শুধু অবিবেচক নয়, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে বলেই ধরে নেয়া যায়। ওয়ালিং কাজ করছিলেন সন্দেহভাজন অপরাধীর মৃত্যুর কারণ নিয়ে। নিবিড়ভাবে এ চাপ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। যতটা সম্ভব শান্তভাবে কাজ করার চেষ্টা করছিলেন। জর্জ ওয়ালিং ভাবছিলেন ওয়েস্টারভেল্টের উপর নির্ভর করা চলে। একথা সর্বজন সত্য ওয়েস্টারভেল্ট নিজেও জানেন না শার্লি রসকে কে বা কারা অপহরণ করেছে? অপহরণকারীরা কোথায় আটকে রেখেছে তা জানেন না ওয়েস্টারভেল্ট। তারপরেও জর্জ ওয়ালিং সাক্ষাত করলেন

ওয়েস্টারভেল্টের সাথে। পুলিশ বিভাগের এবং সাধারণ মানুষের সমালোচনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্যই এ সাক্ষত করেন। ক্রিশ্চিয়ান রস নিজেও চাচ্ছিলেন ওয়েস্টারভেল্টের সাথে কথা বলতে। তাকে বহু কষ্টে সম্মত করালো জর্জ ওয়ালিং। ফিলাডেলফিয়াতে যেতে সম্মত হলো ওয়েস্টারভেল্ট। এদিকে ওয়েস্টারভেল্টের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিল ফিলাডেলফিয়া পুলিশও। তার সাথে কথা বলেই শার্লি রসের অপহরণের সব রহস্য বেরিয়ে আসবে। ফিলাডেলফিয়াতে পৌছানোর সাথে সাথেই পুলিশ ওয়েস্টারভেল্টকে গ্রেফতার করে এবং তাকে জেলে পাঠিয়ে দেয়। তার বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ আনা হয়। তিনিই প্রধান ষড়যন্ত্রকারী। এটাই তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। ওয়েস্টারভেল্টের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার জন্য প্রধান সাক্ষী হয়েছিলেন জর্জ ওয়ালিং

ক্রিশ্চিয়ান রস যখন জানতে পারল, ওয়েস্টারভেল্ট ফিলাডেলফিয়া জেলে রয়েছে তখন সে আর দেরি করল না। অসুস্থ শরীর নিয়েই ওয়েস্টারভেল্টের সাথে সাক্ষত করতে জেলে গেলেন। তার সাথে সাক্ষাত হল। জেলের অভ্যন্তরে দু'জনের কথা হল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে ক্রিশ্চিয়ান রস সাংবাদিকদের বললেন,

"ওয়েস্টারভেল্ট তাকে এ আশ্বাস দিয়েছে শার্লি এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু মোশেরকে হত্যা করা হয়েছে। সত্যি বলতে কি শার্লি রসের বেঁচে থাকার খবর জানতে পেরে যেন মুক্তি পেলাম। সন্তানের বেঁচে থাকার খবর জানতে পারায় প্রতিটি বাবা যেমন খুশি এবং আনন্দ পায় আমিও তেমন আনন্দ পেলাম।"

৩০ আগস্ট ১৮৭৫, ওয়েস্টারভেল্টকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল। তার পক্ষের আইনজীবীরা তাকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করল। আদালত তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। সরকার পক্ষের কৌশলীরা আদালতকে জানান,

"এটা কোন সাধারণ ঘটনা নয়।"

রিমান্ডের আবেদন করে সরকার পক্ষের কৌশলীরা। তারা অভিযোগ করে শার্লি রসকে নির্যাতন করেছে ওয়েস্টারভেল্ট। মোশের এবং ডগলাসও তার সাথে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে জর্জ ওয়ালিংয়ের বিরুদ্ধে ভয়াবহ খেলায় মেতে উঠতে চেয়েছিলেন ওয়েস্টারভেল্ট। তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। জর্জ ওয়ালিং তার সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে হাজির করলে এটাই প্রমাণিত হয় ওয়েস্টারভেল্ট এ অপহরণের সাথে জড়িত। কিন্তু এসব তথ্য প্রমাণে অনেক কিছুই ছিল সাজানো নাটক। তদন্ত করে দেখা গেল জর্জ ওয়ালিং অনেক কিছু বানিয়ে বলেছেন।

BanglaBook.org

আদালত এ বিচারকার্য অ্যাটর্নির কাছে প্রেরণ করতে বাধ্য হল। এ্যাটর্নি জেনারেল অনেক গবেষণা করে দেখতে পান ওয়েস্টারভেল্ট পুলিশকে ভুল পথে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছে। আবার এসপি জর্জ ওয়ালিংয়ের সব তথ্য সঠিক ছিল তা নয়। তার মধ্যেও মিথ্যার আশ্রয় ছিল। নায়ক সাজার জন্যই এ কাজ করেছেন। এটা ঠিক ওয়েস্টারভেল্ট অপহরণকারীদের কাছ থেকে হয়তো মুক্তিপণের টাকার অংশ বিশেষ পাবে এ লোভে তাদের সম্পর্কে পুলিশকে সঠিক তথ্য দেয়নি।

বিরোধী পক্ষের আইনজীবীরা আদালতকে জানাল,

"বলির পাঠার মত ওয়েস্টারভেল্টকে ব্যবহার করেছে জজ ওয়ালিং। তার অযৌক্তিক সাক্ষী প্রমাণের জন্যই ওয়েস্টারভেল্টকে দোষী বানিয়েছে।"

পুলিশের সাথে যথাসম্ভব ভাল আচরণ করেছিল ওয়েস্টারভেল্ট। কিন্তু কোনপক্ষই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আদালত ওয়েস্টারভেল্টের কাছে জানতে চাইল ,

"উইলিয়াম ওয়েস্টারভেল্ট, আপনার কাছে এমন কোন প্রমাণ আছে কি যে বাচ্চা শিশু শার্লি রসকে ছলে-বলে, কৌশলে বা জোরপূর্বক অপহরণ করা হয়েছে?"

ওয়েস্টারভেল্ট তার উত্তরের বলল,

"ঈশ্বরের দোহাই, শার্লি রসের অপহরণ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।" কোন সমাধান হল না, বাধ্য হয়ে আদালত এ মামলা এক সপ্তাহের জন্য মুলতবী করল। এক সপ্তাহ পর পুনরায় যখন বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হল তখন আদালত রায় দিল,

"শার্লি রসকে জোরপূর্বক অপহরণের ঘটনায় ওয়েস্টারভেল্ট জড়িত নয়। তিনি সম্পূর্ন নির্দোষ। তবে তিনি অপহরণের যে কৌশল সেই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকায় দোষী। তিনিও মুক্তিপণের টাকার ভাগ-বাটোয়ারা দাবী করেছিলেন। শার্লি রসের মুক্তির ব্যাপারে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন।"

৯ অক্টোবর, ১৮৭৫, বিচারক এনকক এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। তিনি ওয়েস্টারভেল্টকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। ক্রিশ্চিয়ান রস জেল গেটে গিয়ে ওয়েস্টারভেল্টের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন তাকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করবেন যদি শার্লি রসের কোন সংবাদ দিতে পারেন। সে যদি জানে শার্লি রস বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে– সে তথ্যটুকু যেন জানায়। ওয়েস্টভেল্ট শুধু বলল,

"আমি কিছুই জানি না।"

BanglaBook.org

১৮৮১ সালের জানুয়ারিতে ওয়েস্টারভেল্ট জেল থেকে মুক্তি পেল। সদ্ব্যবহার এবং আচরণের জন্য তার ১ বছর শাস্তি কমানো হয়। জেল থেকে বের হয়ে সে ঘোষণা দিল,

"যেভাবেই হোক শার্লিকে খুঁজে বের করতে সে প্রাণপণচেষ্টা করবে।"

এর বেশি কিছু জানায়নি সে।

শার্লি রসের খোঁজ চলল পুরো এক দশক ধরে। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ একটার এর একটা নতুন নতুন কল্পকাহিনী সাজিয়েই চলেছে। কাজের কাজ কিছুই হল না। ক্রিশ্চিয়ান রস তার ছেলের খোঁজ মৃত্যু পর্যন্ত করে যেতে থাকেন। সন্তানের খোঁজ খবর নেয়া শেষ হয় ১৮৯৭ সালে যখন ক্রিশ্চিয়ান রস মৃত্যুবরণ করেন। তার স্ত্রী সারা রস বিশ শতকেও সন্তানের সন্ধান করতে থাকেন। ততদিনে শার্লি রস (বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই) মধ্যবয়সী যুবকে পরিণত হয়ে গেছে। সারা রস বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। চলাফেরা করতে পারেন না ঠিকমত। এ সময় একদিন সারা রস জানতে পারলেন, ৪০ বছরের এক ব্যক্তি নিজেকে শার্লি রস বলে দাবী করেছেন। সারা তার ভাইকে পাঠান ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বলতে, সেখানেও ভুল প্রমাণিত হল।

১৯৪৩ সালে শার্লির ছোট ভাই ওয়াল্টার যিনি শেয়ার ব্যবসায়ী তিনি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন,

"এ অপহরণের নাটক আজও চলছে। এ পর্যন্ত ৫,০০০ ছেলে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ নিজেদেরকে শার্লি রস বলে দাবী করেছে। সবই মিথ্যা এবং ভুল প্রমাণিত হয়েছে।"

শার্লি রসের অপহরণের ঠিক শত বছর পরও ফিলাডেলফিয়াতে চার বছরের একটি শিশু অহরণ হয়। পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়,

"এ শিশুটি শার্লি রসের নাতি।"

যে প্রশ্নের উত্তর কখনোই জানা যায়নি তা হচ্ছে শার্লি রসের জীবনে কি ঘটেছিল? তিনি কি সত্যিই অপহরণকারীদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন? এ ঘটনা চিরকাল রহস্যময় থেকে গেল। কেউ এর কোন সমাধান দিতে পারেনি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নিঃশেষিত কঙ্কাল

বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ দালান এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং যা ১০২ তলা বিশিষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির ৩৪ নম্বর সড়কে ফিফথ এভিনিউতে আকাশ ছোঁয়া এ বিল্ডিং অবস্থিত। উচ্চতার দিক থেকে পরিমাপ করলে এটা এক মাইলের এক চতুর্থাংশ এলাকা বিস্তৃত হবে। এ বিল্ডিংয়ের সর্বোচ্চ তলায় উঠে বহু পর্যবেক্ষণকারি ছাদের থেকে নিউইয়র্ক নগরি সৌন্দর্য উপভোগ করেন। পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া এবং সুশোভিত দিনে যতদূর দৃষ্টি যায় তা দেখতে খুবই মনোরম লাগে। এ বিল্ডিংয়ের ছাদে দাঁড়িয়ে যেদিকে তাকানো হোক না, কেন শুধু দক্ষিণ দিক ছাড়া, যে কোন পার্শ্বে ৫০ মাইল দূরবর্তী শহরও দেখা যাবে। দক্ষিণ দিকে রয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে সুরম্য অট্টালিকা (বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র অবশ্য ২০০১ সালে বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে যায়। নতুন করে আবারও তৈরি করা হচ্ছে)।

আকাশ ছোঁয়া এ এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত শোভা এতটাই আকর্ষণীয় যা এর স্থাপত্যবিদ এবং প্রকৌশলীগণও এতটা কল্পনা করেনি। বিল্ডিংটি এতটাই প্রসারিত, কল্পনা করা যায় কোন বিমান এর মধ্য দিয়ে অনায়াসে পরিভ্রমণ করতে পারবে। কোন বিমান দুর্ঘটনাবশত এ বিল্ডিংয়ে আঘাত হানলে এর যাত্রীরা ছিটকে যাবে ঠিকই তবে তারা হেঁটে বের হতে পারবে। বাচ্চা শিশুরা এ সুউচ্চ পরিসর দালানের সিঁড়ির রেলিং ধরে যদি নামতে চেষ্টা করে অবলীলাক্রমে এবং কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন ছাড়াই নিচে নেমে যেতে পারবে। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল তাদের আনন্দময় মুহূর্ত কাটাতে পারবে এ এম্পায়ার এস্টেট বিল্ডিংয়ের ছাদে। এতকিছুর পরেও এ বিল্ডিংয়ে দুঃখজনক ঘটনাও ঘটেছে। টাওয়ারের সর্বোচ্চ চূড়ায় ভালবাসায় মত্ত হয়ে বিখ্যাত গরিলা জুটি কিং কং এবং এক সুন্দরী নারী আত্মহত্যা করেছে। হৃদয়ের টানে নিজেদেরকে পৃথিবী থেকে উৎসর্গ করেছে। কিং কং নামে পরিবর্তীতে হলিউডে ছবি হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলেও সত্য এ দুটি ঘটনা চিরকাল রহস্যময় থেকে গেছে। এদের দেহাবশেষ এবং কঙ্কাল এবং হাড়গুলো পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছে। পৃথিবীর যে প্রান্তের মানুষ যখনই এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং পরিদর্শন করতে আসে তখনই তারা এ দুঃখজনক কাহিনী শুনে। কিং কংয়ের প্রতিকৃতি টুইন টাওয়ারে স্থাপন করা হয়েছিল। সবাই এক মুহূর্তের

BanglaBook.org

জন্য হলেও সহানুভূতি ও দুঃখ প্রকাশ করত। এ ধরনের ঘটনা প্রতি মুহূর্তে ঘটবে তা নয়। কালে ভদ্রে ঘটে বলেই এসব ঘটনা চির স্মরণীয় হয়ে থাকে। কিং কং ছবিও যেন সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়েও দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সব প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলই যে সুন্দর মুহূর্তে কাটায় তা ভাবার কোন কারণ নেই। তবে সে সব ঘটনা যতকিঞ্চিতই ঘটে বটে।

২৭ জুন ১৯৭৩, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় সুন্দর বিকালে শীর্ষ ব্যবসায়ী এবং আকর্ষণীয় ও সুন্দরী গৃহবধু হেঁটে বেড়াচ্ছে, গল্প করে সময় কাটাচ্ছে। ছাদের এক কোণায় ব্যবসায়ী এবং সুন্দরী মহিলা প্রেমালাপে মত্ত। তাদেরকে কেউ বিরক্ত করছে না। ফিরেও তাকাচ্ছে না কেউ। বারবার উঁকি দিয়ে তাদের সুন্দর প্রেমের মুহূর্তের ব্যাঘ্যাত ঘটাচ্ছে না। পুরুষ এবং মহিলার বয়সের পার্থক্য দেখে অনেকে অবাক হতে পারে। একেই বলে প্রেম কোন জাত, পাত, বয়স, ধর্ম মানে না। মহিলার বয়স ৪০ এবং যুবক ব্যবসায়ী ২৫ বছরের টগবগে তরুণ। তাদের এ প্রেমালাপে এবং অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কেউ যদি কাছ দিয়ে হেঁটে যেত সেই সুন্দরী মহিলা শংকিত হয়ে উঠত। আতংক ছড়িয়ে পড়ত তার মধ্যে। যা হোক সুন্দরী মহিলা দ্রুত লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। তার প্রেমিক তাকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ঐ সুন্দরী মহিলা তাড়া ছিল। প্রেমিকের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

সাধারণ মানুষ যারা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ে চলাফেরা করছে তারা কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। প্রেমিক-প্রেমিকার হাল্কা ঝগড়া, আর প্রেমিকার আপন মনে ছুটে চলা, এগুলি কোন অসাধারণ ঘটনা নয়। এসব তুচ্ছ ঘটনা মাত্র। ফলে এ ব্যাপারে নজর দেয়ার কিছু নেই। জীবনে এরকম অনেক ঘটনা ঘটে। চলচ্চিত্র জগতে এরকম দৃশ্যে দেখা যায় প্রেমিক তখন প্রেমিকার মান ভাংতে চেষ্টা করে। ছবির পরিচালকরা সব সময় সুন্দর পরিসমাপ্তি দেখাতে চায়। সেভাবেই গল্প ও কাহিনী রচিত হয়। ছবির কাহিনীতে দেখানো হয়, প্রেমিকের সুলোলিত আহ্বানে রাগী প্রেমিকার কঠিন হৃদয় নরম হয়। দুঃখের পরিণতি কেউই দেখতে চায় না।

কিন্তু জীবন কখনো কখনো কঠিন থেকে কঠিনতর হয় বৈকি। যা সিনেমা এবং কল্প কাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায়। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। এরকম একটি ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের কাছে আজও বিস্ময় মনে হয়। সারা পৃথিবী চিন্তা করে এর কোন সমাধান করতে পারেনি।

রহস্যময়ী নারীর হাড় গোড়ের ছবি তুলে ধরেন ইতিহাসবিদ ক্রিস্টোফার জি. জানুস

আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে টাইকুন ড্রাগনের কাহিনী সবাইকে বিচলিত করে। এ নরপিশাচ ড্রাগনের পৃথিবীতে আগমন এবং ধ্বংসের ৬০ বছরের পরও ধ্বংসাবশেষ, হাড়, কঙ্কাল মানুষকে নতুনভাবে বিচলিত করে। এর সাথে সার্বক্ষণিক ক্ষমতাবান গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় এবং অর্থলোভী ব্যবসায়ী এক হয়ে এর অস্তিত্ব ধ্বংসে কাজ করেছে। টাইকুন ড্রাগন রক্ষা করতে এবং প্রবল ঝড়ে বিপদগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিল নৌবাহিনী। বহু মানুষ, নারী, পুরুষ, শিশু ঝড়ে মারা যায়। মৃত ড্রাগনসহ মানুষের হাড়, অস্থি মজ্জা জাদুঘরে জমা রাখা হয়। কিন্তু এ ঘটনার সাথে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের ঘটনায় কোন মিল নেই। প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল ছাদে প্রেমালাপ এবং তর্ক, বিতর্ক তারপর মহিলার চলে যাওয়া, এ যে তাদের চারিত্রিক বৈপরীত্য তা মানুষকে আরও ভাবিয়ে তোলে। পুরো ঘটনাই ছিল জটিল আবর্তে ঘেরা। অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, মহিলার শেষ পরিণতি কি হল? ঐ মহিলা তার প্রেমিককে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের সর্বোচ্চ তলায় নিয়ে গেল। এতে কোন রহস্যের ব্যাপার ছিল না। প্রেমিক-প্রেমিকা ছাদে উঠতেই পারে। নিজের ইচ্ছাই মহিলার হাত ধরে ছাদে উঠছিল প্রেমিক। তিনিও রহস্যের সমাধান করতে চাচ্ছিলেন। পুরুষটির নাম ছিল ক্রিস্টোফার জি জানুস। তিনি ছিলেন শিকাগোর পুঁজিবাজারের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক, একই সাথে পরোপকারী ব্যক্তি। তার বিশাল সম্পত্তির একটি অংশ সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।

এ রহস্যের সমাধান করতে এগিয়ে এসেছিলেন মনোবিজ্ঞানী এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বহুল পরিচিত মিস্টার জানুস। তিনি ১৯৭৩ সালে সাংস্কৃতিক বিনিময়ে এক অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি হিসাবে চায়নায় ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি ঘটনা তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। চায়না সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তা তাকে মূল অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে বলেছিলঃ

"পিকিং ম্যান (পিকিং মানব) অনুসন্ধানে আমাদের সাহায্য করুন। আপনি যদি আমাদেরকে পিকিং ম্যান এনে দিতে পারেন তাহলে চায়নার কাছে মহানায়কে পরিণত হবেন।"

ক্রিস্টোফার জানুস বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করলেন। যদি তিনি সত্যিই কোন পিকিং ম্যান সম্পর্কে বিস্তাতির তথ্য এনে দিতে পারেন তিনি ৮০ কোটি (সে সময় চীনে লোকসংখ্যা ছিল ৮০ কোটি) চায়নার কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সন্দেহাতীতভাবে চায়না এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নে অনন্য

ভূমিকা পালন করতে পারবেন। জানুসের মধ্যেও এ ব্যাপারে গবেষণা করতে ব্যাপক কর্মস্পৃহা সৃষ্টি হল। আবার একইভাবে এটা সত্য, তিনি কখনোই পিকিং ম্যানের কথা শোনেননি। এ ব্যাপারে তার কাছে কোন তথ্য ছিল না। এ গবেষক নিজে উদ্যোগী হয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। শুরু হয় দিনরাত পরিশ্রম। জানুসের এ গবেষণার কথা পুলিশ বিভাগ জানতে পারল। পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা সংস্থা তাকে সার্বিক সহায়তার জন্য এগিয়ে এল। তারা প্রাথমিক কিছু তথ্য সরবরাহ করল। তথ্য থেকে জানতে পারলেন, পিকিং ম্যান পৃথিবী থেকে নিঃশেষিত হয়েছে ২ বার। প্রথমবার খ্রিস্টপূর্ব ৫ লাখ বছর আগে। দ্বিতীয়বার পিকিং ম্যানের সন্ধান পাওয়া যায় জানুসের গবেষণার ১৫ বছর আগে, ১৯৪১ সালে। আরেকটি একক সত্তা ও ধারণা পাওয়া যায় তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং চল্লিশজন গবেষক এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছিল।

বিভিন্ন জার্নাল থেকে জানুস তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছিলেন। আর কিছু উপাত্ত নিয়েছিলেন পুরনো পত্র-পত্রিকা থেকে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ড. হ্যারি এল শ্যাপিরোর কাছ থেকে। এ ভদ্রলোক যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক জাদুঘরের নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত জীব বিজ্ঞানীও বটে। বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রয়েছে তার। জানুসকে পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। ড. হ্যারি এল শ্যাপিরো কখনো আশা ছাড়েননি এবং তার বিশ্বাস ছিল এ পৃথিবীতে পিকিং ম্যান আবার দেখা যাবে। শ্যাপিরোর এ আশা অবশ্য নতুন কিছু নয়। অতীতের ঘটনাবলী এবং বিভিন্ন হাড় সংগ্রহ করে তিনি দৃঢ়তা পোষণ করতেন, পিকিং ম্যান আবার আসবে এ ধরিত্রীতে। তার বিশ্বাস কোথাও না কোথাও পিকিং ম্যান রয়েছে। শ্যাপিরোর আশাবাদে নতুনত্ব কিছু ছিল না। তবে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যদি এ ব্যাপারে কোন গবেষণা কার্যক্রম প্রত্যাখ্যান করতেন এবং সবাইকে অসম্ভব বলে জানিয়ে দিতেন, তাহলে হয়তো কেউই পিকিং ম্যানের অনুসন্ধান করত না। হতাশ হত সবাই। গবেষকরা নতুন করে জানল তারা পিকিং ম্যানের খোঁজ করছে। যেখানে যত হাড়, অস্থি, মজ্জা, কঙ্কাল পাওয়া গেল তা নিয়ে নতুন করে গবেষণা হতে থাকে। কয়েক হাজার, লাখ বছরের কঙ্কাল, ফসিল, তাদের আকৃতি কেমন এ নিয়ে লেখা হতে থাকে শত শত প্রতিবেদন।

১৯২০ সালের আগে গবেষকরা এটা অন্তত জানতে পারেনি, পিকিং ম্যান চিরতরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাদের পক্ষে এটাও জানা সম্ভব হয়নি, পিকিং ম্যান নতুন করে পৃথিবীতে আর আসবে না। তাহলে যে প্রাণী (পিকিং ম্যান

সম্পর্কে বলা হচ্ছে) সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং এর অস্তিত্ব যেহেতু বিনাশ হয়ে গেছে তাহলে কিভাবে এটা খুঁজে পাওয়া যাবে? এ চিন্তা করতে থাকেন জানুস। তাই বলে তিনি হাল ছেড়ে দেননি। এজন্য নিজের মনে একটি কল্পিত দর্শনীয় স্থানের চিন্তা করে নিলেন। প্রথমে তাকে বিশ্বাস করতে হল, ড্রাগনের হাড়ের অস্তিত্ব নিয়ে। ড্রাগন পৃথিবীতে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু এর হাড়-গোড়, ফসিল, অস্থি, মজ্জা এখনও রয়েছে এ ভূখণ্ডতে। সন্ধান করলে কোথাও না কোথাও ড্রাগনের সন্ধান পাওয়া যাবেই। সেভাবেই এগুতে হবে।

ড্রাগনের কঙ্কাল, হাড়, অস্থি, মজ্জা এসব কিছু সাধারণ ঔষুধের দোকান বা ল্যাবরেটরিতে পাওয়া যেতে পারে। সেখানেই খোঁজ খবর নিতে হবে। চায়নাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে ঔষুধের দোকানে ও গবেষণাগারে সামান্য অর্থের বিনিময়ে এসব মূল্যবান হাড়, কঙ্কাল বিক্রি হত অবলীলাক্রমে। এর জন্য কোন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন প্রয়োজন হত না। ডাক্তারদের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিলেই চলত। গবেষণাগারের ফার্মাসিস্ট ও রসায়নবিদ ঔষুধ-পত্র ঠিকমত ব্যবহার করে ড্রাগনের হাড় ও কঙ্কাল সরবরাহ করত। তারাও প্রচুর অবৈধ অর্থ উপার্জন করত।

চৌ কৌ তিয়েন ঔষুধ মজুতকারী কারখানায় পিকিং ম্যানের সন্ধান পাওয়া যায়। এ কারখানাটি ছিল পিকিং থেকে ৩০ মাইল দূরে। এ কারখানায় বিজ্ঞানীরা ড্রাগনের হাড় আলাদা করে ও মানুষের হাড়ের সাথে মিশিয়ে এক ধরনের মানবদেহ তৈরি করত। প্রাচীনকালে অরণ্যে হিংস্র পশুর হাড়, কঙ্কাল সরবরাহ করত তারা। ফসিল এবং কঙ্কাল দেখে অনেকেই অবাক হত। এমনকি মৃত ব্যক্তির দাঁত সংগ্রহ করে রাখা হত। সেসব দাঁত কঙ্কালের মুখমণ্ডলে লাগিয়ে দেয়া হত।

এশিয়া মহাদেশের বাইরে প্রশান্ত এবং আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে কোন ভূখণ্ডে এরকম কোন মানুষের সন্ধান বা এর হাড়, গোড়, কঙ্কাল পাওয়া যায়নি। কখনো কোন কঙ্কাল বা দেহাবশেষের অস্তিত্বের সন্ধান মেলেনি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে এর সম্ভাব্য কোন সমাধান পাওয়া যায়নি কখনো। বিজ্ঞানীরা এ পিকিং ম্যান নিয়ে বহু পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু কোন সমাধানে পৌঁছতে পারেননি।

এদিকে চায়নার পাইকারী কঙ্কাল বিক্রেতারা বন্য প্রাণীর হাড় ও কঙ্কাল সরবরাহ করত। ঔষুধ কারখানার মজুতকারীদের কাছে এসব বন্য হাড় বিক্রি করত। যারা এসব বন্য হাড়, কঙ্কাল সরবরাহ করত তারা অত্যন্ত সতর্ক থাকত।

BanglaBook.org

যে এলাকা এসব বিক্রি হত সে এলাকার নাম হয়েছিল চিকেন বোন হিল। পুরো এলাকা এমনভাবে ঘেরা ছিল, বাইরে থেকে কারো বুঝার উপায় ছিল না, এখানে বন্য কঙ্কাল অবাধে বিক্রি হচ্ছে। আগ্রহ নিয়ে কেউ ভ্রমণে আসলে বা এলাকা ঘুরে দেখতে চাইলে তাকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হত। শুধুমাত্র যারা এসব ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিল তারা এবং তাদের পরিচিতরা ছাড়া আর কেউ এই এলাকায় প্রবেশ করতে পারত না। এমনকি মৃতদেহ সৎকারের পর সেসব কঙ্কাল অবাধে বিক্রি হত। এ ব্যবসায় মুনাফা করে নিত এক শ্রেণীর অসাধু ব্যসায়ীরা। এ এলাকায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে দাঁতের কৃত্রিম মাড়ি সুন্দরমত স্থাপন করা হত। চিকিৎসক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী, গবেষক সবাই কাজ করতেন চৌ কৌ তিয়েনে। এদের মধ্যে অন্যতম ডা. ডেভিডসন ব্ল্যাক। তিনি পিকিং ইউনিয়ন অব মেডিকেল কলেজের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তার গভীর বিশ্বাস ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের অমরত্ব লাভ করা সম্ভব হবে। তিনি নিজেও নানান ঔষধপত্র নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ১৯২৭ সালে ঔষধশিল্পে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন।

পিকিং ম্যান সম্পর্কে ডেভিডসন বর্ণনা করেছেন,

"পূর্ব এশিয়ায় বহু বছর আগে যে মানবের কথা বলা হচ্ছে তার অস্তিত্ব আর কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। হয়তো কোথাও না কোথাও এর অস্তিত্ব রয়েছে।"

ডেভিডসনের এ বক্তব্যে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হল। বিশেষ করে তরুণ গবেষক, যাদের এ বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, তারা নব উদ্যমে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা শুরু করল। ডেভিডসন ব্ল্যাক কানাডীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে বইপত্র নিয়ে পিকিং ম্যান বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণা ও তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ বা প্রশ্নের উদ্রেক হয়নি।

সব সময় নিজের কর্মকাণ্ড খোলাসা করে বলতেন,

"আমি কি করতে চাই এবং পিকিং ম্যানের অস্তিত্ব সম্পর্কে আদৌও আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব কিনা তা তিনি নিশ্চিত নই।"

তিনি নিজেকে একজন শিক্ষানবীশ এবং নবাগত তরুণ বিজ্ঞানী ভাবতেন। মানব দেহের অস্থি, মজ্জা, হাড়, কঙ্কাল এসবই তার কাছে বিশেষ করে পিকিং ম্যান সম্পর্কিত তথ্য অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। একথা সত্য ডেভিডসন ১২ বছর বয়সে চিকিৎসাবিদ্যায় জ্ঞানার্জনের জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে লন্ডনে গিয়ে সেখানে শরীরবিদ্যা বিশারদ অধ্যাপক ইলিয়ট স্মিথের কাছ থেকে

BanglaBook.org

জ্ঞানাহরণ করেন। অ্যানাটমি বিদ্যায় পারদর্শী হন তিনি। ইলিয়ট স্মিথের শরীরবিদ্যা প্রকল্প দেখে ডেভিডসন ব্ল্যাক অতীব আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি এ প্রকল্পে কাজ করতে মনস্থির করেন। লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানব দেহের ফসিল, কঙ্কাল দেখে ডেভিডসনের মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে মানুষ আকৃতিগতভাবে কেমন ছিল? ইংল্যান্ডে বেশ কয়েক বছর আগে পিন্টডাউন ম্যানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ মানব দেহের আকৃতি-প্রকৃতি বেশ তারুণ্য নির্ভর। তবে এ মানবের অস্তিত্ব কোথা থেকে এসেছে তা জানা যায়নি। পিন্টডাউন ম্যানকে মহান এবং জগদ্বিখ্যাত অ্যাথলেটদের সাথে তুলনা করেছেন ডা. ডেভিডসন ব্ল্যাক। অনেকে তাদেরকে টম সেভার এবং বিল জিন কিংয়ের সাথে মিল খুঁজে পেয়েছেন। ব্ল্যাক কখনোই মানবতন্ত্রের শিকল ও শারীরিকগত যে পরিবর্তন ঘটে তা নিয়ে কখনোই গবেষণা করতে হাল ছেড়ে দেননি। পিন্টডাউন সম্পর্কে ব্ল্যাক যদি প্রকৃত তথ্য ও সত্য জানতে পারতেন, তাহলে তিনি হয়তো অনুপ্রাণিত হতেন না। গবেষণা বন্ধ করে দিতেন। এক্ষেত্রে পিকিং ম্যান আর কখনোই আবিষ্কার হত না। নিদেনপক্ষে পরবর্তী বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ হতাশ হত, তারা আশা ছেড়ে দিত।

পিল্টডাউন ম্যানকে বর্তমান সময়ের মানুষের পূর্বসূরী ভাবা হচ্ছে। তাদের চাল-চলন, আচার-আচরণ একেবারে মানুষের মতই। হুবহু মিল রয়েছে। দক্ষতার দিক থেকেও তারা অনেক উন্নত। বিশেষ করে তাদের চোয়াল এবং মুখাকৃতি একেবারে মানুষের সাথে মিলে যায়। পিল্টডাউন ম্যান নিয়ে গভীর সংশয়ে ছিলেন ডেভিডসন ব্ল্যাক। বহু চেষ্টা করেও এর প্রকৃত উৎস ভূমি খুঁজে পাননি। বরং তার জীবদ্দশায় পিন্টডাউন ম্যান বিজ্ঞানের জগতে বিশেষ করে জীব বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ আসরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডেভিডসন ব্ল্যাক ১৯৩৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পরে পিন্টডাউন ম্যান নিয়ে যত গবেষণা তা ছলচাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। সব তথ্য প্রকাশ পেল। দু' ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পিন্টডাউন ম্যান সম্পর্কে নতুন তথ্য হাজির করলেন। ১৯৫৫-তে তারা পুনরায় এর হাড়, অস্থি, মজ্জা, কঙ্কাল নিয়ে গবেষণা করে নতুন তথ্য উপস্থাপন করলেন।

ডেভিডসন ব্ল্যাক যে তথ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, নতুন দু' ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অত্যন্ত সন্তর্পণে সমালোচনা করলেন। তিনি মূলত পিন্টডাউন ম্যানের চোয়াল এবং মাড়ি নিয়ে গবেষণা করে এবং এর সাথে মিলিয়ে পিকিং ম্যানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। এটাই ছিল ব্ল্যাকের অত্যন্ত দুর্বল দিক এবং চরম ভুল সিদ্ধান্ত।

BanglaBook.org

পিকিং ম্যানের প্রতিকৃত

১৯২৯ সালের আগ পর্যন্ত পিকিং ম্যান এবং পিন্টডাউন ম্যান এ দু'য়ের মধ্যে শারীরিকগত মিল পাওয়া যায়নি। ডেভিডসন ব্ল্যাক এবং তার সতীর্থ গবেষক ড. ডব্লিউ সি পেই ৩০ এর দশকে পিকিং ম্যানের চোয়াল্ল এবং এর গঠন প্রকৃতি ও কঙ্কালের সন্ধান পান। সেটাও যথেষ্ট ছিল না। তারা নিয়মিত গবেষণা এবং খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। বিশেষ করে লাখ লাখ বছর পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল এবং আদৌ কোন মানুষ ছিল কিনা তা জানার চেষ্টা করেন। একটা পর্যায়ে তারা ক্ষান্ত দেন। তারা গবেষণা কার্য থামাতে বাধ্য হন। চায়নার সামন্ত প্রভুরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ডেভিডসনের গবেষণা এবং কার্যক্রম সবই ব্যহত হয়।

১৯৩৭ সালে জাপানের দখলে আসে চায়না। সেখানে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। স্থায়ী ভিত গড়ে তোলে সূর্যদয়ের দেশের শাসক গোষ্ঠী। চায়নার উপর শুরু হয় নির্যাতন। তাদের সব ধরনের কর্মকাণ্ড, এমনকি বিজ্ঞানীদের উপর নির্যাতন করে শাসক গোষ্ঠী। একের পর এক বিজ্ঞানী, গবেষক এবং তাদের পারিবারিক হিউম্যান চেইন সবকিছুই করায়ত্ত করে জাপান। একক মানব সত্তা গবেষণা সবকিছুই জাপানের অধীনে চলে যায়।

জাপানীরা চায়নার গবেষণাগারে মানব দেহের যত কঙ্কাল, হাড় সবকিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এসব হাড়, অস্থি, মজ্জা তারা নষ্ট করে ফেলে। চল্লিশটিরও বেশি সৃষ্টিশীল মানব কঙ্কাল পুড়িয়ে ফেলা হয়। এ ঘটনার পূর্বে মানব দেহের হাড়, কঙ্কাল নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালিয়েছিল চায়না। ডেভিডসন ব্ল্যাকের প্রমাণপত্র, দলিল ও তথ্য থেকে জানা যায়, পিকিং ম্যান নিয়ে তার যে গবেষণা তা আজকের মানব গোষ্ঠীর সাথে মিল রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সে ধারণা পাওয়া যায়।

পিকিং মেডিকেল কলেজের গবেষণাগারে যারা কাজ করতেন তারা সে কঙ্কাল ও ফসিলগুলোতে ঠিকমত ঔষুধ প্রয়োগ করত, যাতে নষ্ট না হয়। তারা এটাকে মজুতখানা মনে করত। কোন মরণশীল বস্তু এতটা সম্মান পাবে, যত্ন করে রাখা হবে, তা ভাবাই যায় না। এসব কিছু করা হত বাস্তবিক অর্থে মানুষ কোন প্রকৃতির ছিল, আদি উৎস কি ছিল তা জানার জন্যই। তাদের শারীরিক গঠন কেমন ছিল, কবে থেকে মানুষের এ পৃথিবীতে আগমন ঘটেছে তার সঠিক হিসাব বের করার জন্য। মানুষ কেমন ছিল সেটাও জানতে চেয়েছিল বিজ্ঞানীরা। প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে মানুষের দৈহিক পরিবর্তন কতটা ঘটেছে এসব কিছু বিজ্ঞান গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। বাস্তব প্রমাণের ভিত্তিতেই এসব কাজ করা

BanglaBook.org

হয়েছে। ড. জানুস অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে সম্পূর্ণভাবে এর মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে পিকিং ম্যান সম্পর্কে সব তথ্য হাজির করার জন্য যেন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। এটা ছিল তার চ্যালেঞ্জ। এক পর্যায়ে তিনি বিপদের সম্মুখীন হন। আত্মরক্ষার জন্য যতটা সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যতই পিকিং ম্যান খোঁজ করা হোক না কেন, এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে পত্র-পত্রিকার লোকজনদের কাছে গিয়ে খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। তারা কোন সাহায্য করতে পারেনি ড. জানুসকে। ড. জানুস হতাশ হলেও আশা ছাড়েননি ড. শ্যাপিরো।

বিজ্ঞানী ড. শ্যাপিরো এবং ড. জানুসকে পিকিং মেডিকেল কলেজের দালালরা আশ্বাস দিয়েছিল তারা যতটা পিকিং ম্যান ম্যাচ করতে পারবে তার থেকেও বেশী এবং নিখুঁত পিকিং ম্যান যোগাড় করে দিতে পারবে। এ পিকিং ম্যানের জীবন প্রণালী ভিন্ন প্রকৃতির। জানুস আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। তার মনে হল রহস্যের সমাধান হতে চলেছে। এ সমাধানের প্রথম ধাপ হচ্ছে টাকা। অবৈধ মজুতকারীদের পর্যাপ্ত টাকা দিলেই পিকিং ম্যানের কঙ্কাল, ফসিল সরবরাহ করবে। ড. জানুসের কাছে অকল্পনীয় ব্যাপার মনে হল। যাকে বলে মিরাকল ঘটনা।

মজুতকারীদের সাথে অলিখিত সমঝোতা হল। তারা জানাল ১৯৪১-এর নভেম্বরে দু'টি বাক্সে মানব দেহের কঙ্কাল রাখা হয়েছিল। সেগুলি পিকিং ম্যানের কঙ্কাল তা কারও জানা ছিল না। বাক্স দু'টি বিদেশে পাচার করা হয়েছিল। বিজ্ঞানীরাই তা করেছিল। তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধের কারণেই একে অপরের বিরুদ্ধে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে বিরোধের কারণেই ঐ বাক্সে পিকিং ম্যানের কঙ্কাল পাচার করা হয়। উপরন্তু চায়নার শাসক গোষ্ঠী তখন বারবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছিল। এর ফলে বিজ্ঞানীদের বেঁচে থাকাই ছিল দুশ্চিন্তার কারণ। বিজ্ঞানীরা পিকিং ম্যানের হাড়, কঙ্কাল নিরাপদে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল। সে চেষ্টাই তারা করল। কিন্তু সে সময় চায়না থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কিছু নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। পথও ছিল বন্ধুর। চল্লিশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হত তা সাহায্য করত রক ফেলর ফাউন্ডেশন। তারা চায়নার সাথে চুক্তি করে যে, পিকিং ম্যানের কঙ্কাল দেশেই থাকবে। কোনভাবে যদি কঙ্কাল, হাড় বা অন্য কোন অংশ দেশের বাইরে পাচার হয় তাহবে চুক্তির বরখেলাপ, এতে করে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যেতে পারে। এমনকি আইনি লড়াই হতে পারে। এ ধরনের চুক্তির ফলে পিকিং

BanglaBook.org

ম্যানের কঙ্কাল এবং হাড় গোড় সবকিছু আমলাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। কেউই আর পিকিং ম্যানের ফসিল বা কঙ্কাল নিয়ে মাথা ঘামায়নি। অবস্থা এমন দাঁড়াল, সবকিছু ফাইল বন্দি অবস্থায় পড়ে রইল।

এ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে বের হওয়ার অবশ্য পথ একটা ছিল। কূটনৈতিক পথেই সে সমাধান হতে পারে। কূটনৈতিকভাবে চায়না ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সুদৃঢ় হলে তবেই এসব ফসিল এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর সম্ভব এবং তা নিয়ে গবেষণা করা যাবে। গবেষণা শেষে আবার চায়নায় ফিরিয়ে দিতে হবে। অতি জরুরী ভিত্তিতে সে সময় চায়না নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নেলসন জনসন সরকারের সাথে সমঝোতা করেন। তবে তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন, এ কঙ্কালের অন্যরকম গুরুত্ব রয়েছে।

আরো একটি পথে ফসিলগুলো চায়না থেকে বের করার পথ ছিল। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ বাহিনীকে কাজে লাগানো হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জাহাজগুলো ফিলিপাইনের বন্দরে অবতরণ করে। তারপর বিশাল বাক্স নৌবাহিনীর জাহাজে তুলে দেয়া হয়। বাক্সে কি পাঠানো হয়েছিল কেউই জানতে পারেনি। পিকিং ম্যানের কঙ্কাল ও হাড়, গোড়, অস্থি, মজ্জা বাক্সে পাঠানো হয়েছিল। সেটা পাঠানো হয়েছিল হলোক্যাম্প ফার্মাসিস্ট মেট হারম্যানের ডেভিসের কাছে। ডেভিস নিজের কাছে দুটি বাক্স রেখে বাকীগুলো ফিলিপাইনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সেগুলো দুর্ভাগ্যজনক বশতঃ সেখানে পৌঁছেনি। কারণ পরেরদিন জাপানী যুদ্ধ বিমান পার্ল হার্বারে বোমা বর্ষণ করে এবং ফিলিপাইন নিজেদের দখলে নেয়।

হেরম্যান ডেভিস এবং তার সতীর্থদের তিসেনতেন ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই তাদের বড় অপরাধ। খুব অল্প সময়ের মধ্যে জাপানী বাহিনী এসব অপরাধীদের হলোকম্প থেকে তিসেনতেন ক্যাম্পে প্রেরণ করে। ডেভিসকেও তারা আহত করে। তিনি যখন সুস্থ হন তখন দেখতে পান তার কাছে কিছুই নেই। তিনি নিশ্চিত হন ব্যাগ লুট হয়ে গেছে, দুটি বিশাল বাক্স ছিল তাও নেই। বাস্তবিক অর্থে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কোন উপায়ন্তর খুঁজে পেলেন না। তার মনে শুধু একটাই চিন্তা হচ্ছিল পিকিং ম্যান কি ধ্বংস করে দেয়া হল? জাপানীরা যেভাবে পার্ল হারবারে বোমা বিস্ফোরণ করেছে তাতে সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারই কথা। নাকি শত্রুপক্ষের সৈন্যরা ঐসব বাক্স লুট করে নিয়ে গেছে। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, তারা মূল্যবান এবং ব্যবহার

BanglaBook.org

উপযোগী সব পণ্যই চুরি করেছে। যুদ্ধের ময়দানে জাপানী সৈন্যবাহিনীর কাছে নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক উপাদানের কোন মূল্য নেই। বাক্সে কি আছে তা নিয়ে ভাবার সময় কোথায়? তাহলে সেনাবাহিনী কি বাক্স থেকে ঐসব কঙ্কাল, হাড় সব রাস্তায় বা সাগরে ফেলে দিয়েছে?

যুদ্ধ শেষে বহু বছর পর জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। জাপানের বিজ্ঞানীরা নিজেদের মত কাজ করেছে এবং তারা পিকিং ম্যান সম্পর্কিত কোন তথ্য কাউকে জানায়নি। বিজ্ঞানীরা বিশেষ আগ্রহে এ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করেন। তারা এ ভেবে গর্ববোধ করত, মানবের পূর্বজন্ম এশিয়াতেই হয়েছে। সামরিক বাহিনীর সহায়তায় জাপানী বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ চীনের গবেষণাকেন্দ্রে পরিদর্শন করত। সেখানে তারা গভীর পর্যবেক্ষণ করত। পিকিং মেডিক্যাল কলেজে পিকিং ম্যান সংক্রান্ত গবেষণা দেখত। তবে তারা কোন কাজে হস্তক্ষেপ করত না। কারণ পিকিং ম্যান নিয়ে গবেষণার চুক্তি চীনের সাথে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেরই হয়েছিল। আর সে কারণেই জাপানীরা এ কূটনৈতিক দর্শন মেনে চলত।

. ৭ ডিসেম্বরের পরে সে চুক্তিও যেন আর থাকল না। কোন বাধা মানল না জাপানীরা। জাপানী সাম্রাজ্য থেকে নির্দেশ এল, যুদ্ধের বিজয়ী সৈনিকদের বীরের মাল্য প্রদান করা হবে। পিকিং ম্যানের হাড় দিয়ে বীর সৈনিকদের মালা দেয়া হবে। এ কাজ এক প্রকার অসম্ভব ছিল কারণ চায়নার সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী কোনভাবেই বিজ্ঞান গবেষণাগার থেকে পিকিং ম্যানের ফসিল লুট করতে দেয়নি। তারা যদি কখনো এরকম দেখতে পায় তাহলে সে সব অপরাধীকে হলোক্যাম্প থেকে টোকিও জেলে পাঠিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চার বছরে বহু অঘটন ঘটেছিল। পিকিং ম্যানের কঙ্কাল কোথায় হারিয়ে গেছে এর কোন সমাধান পাওয়া যায়নি। যুদ্ধের একেবারে শেষ প্রান্তে যখন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এটম বোমা বিস্ফোরণ হল তখন পিকিং ম্যান রহস্য আড়ালে চলে গেল।

BanglaBook.org

পিকিং ম্যানের পুরাকীর্তি রক্ষা কর

২০ নভেম্বর, ১৯৪৫, নিউইয়র্ক টাইমসে লেখা হল :

"পিকিং ম্যানের পুরাকীর্তি রক্ষা কর"।

টোকিও থেকে টাইমস পত্রিকার শিরোনামে এ একই কথা লেখা হল। তারা আরো জানাল,

"টোকিও ইম্পেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার থেকে লুট হওয়া পিকিং ম্যানের ফসিল বিমান বন্দরে পাওয়া গেছে।"

এর ঠিক দুই সপ্তাহ পরে নিউজউইক ম্যাগাজিনের প্রতিবেদক শাংহাই থেকে একই তথ্য জানাল। তাদের প্রতিবেদন ছিল ঃ

"পিকিং ম্যান নিরাপদে রয়েছে"

টোকিও জাতীয় জাদুঘরে প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগে পিকিং ম্যানের ফসিল, অস্থি, মজ্জা, হাড় সবই সংরক্ষিত রয়েছে। জাপানী সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের সময় এসব কঙ্কাল মেডিকেল কলেজের গবেষণাগার থেকে টোকিও জাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়। নিরাপদে এবং সযত্নে রাখে এবং লালন পালন করে। কোন ত্রুটি বা অবহেলা হচ্ছে না, তবে জাপানী গবেষকরা পিকিং ম্যান যেসব পাথর ব্যবহার করত সেগুলো খুঁজতে থাকে। কিন্তু সেসবের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি পরবর্তীতে।

যুদ্ধোত্তর জাপান মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। অনেকের ধারণা ও বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের নৌ এবং সামরিক বাহিনী বহু মূল্যবান সম্পদ লুট করেছে। সবচেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল চীনের প্রতি। চীনের বহু মূল্যবান সম্পদ লুট করেছে। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছে আবার তারাই কোন কিছু লুট হলে দায় দায়িত্ব স্বীকার করেনি। এমনকি কূটনৈতিক দেন দরবারেও কোন কাজ হয়নি। শুধুমাত্র টানাপোড়েন হয়েছে। উভয় পক্ষের মধ্যে কথার ফুলঝুড়ি ছুটেছে। বরফ গলেনি। এদিকে চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে পিকিং ম্যান নিয়ে তদন্ত থেমে গেল। এ সুযোগে জাপানেও পিকিং ম্যান নিয়ে তদন্ত থমকে গেল। বাস্তবে সব কিছু যে একেবারে স্তব্ধ হয়ে পড়ল তা নয়। গৃহযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছর ডাঃ শ্যাপিরো এবং তার সতীর্থরা

BanglaBook.org

বিষয়টি নিয়ে অনেক গবেষণা করলেন। তার সম্পর্কে পিপলস রিপাবলিক অব চায়না থেকে বলা হল,

"ডঃ শ্যাপিরো পিকিং ম্যানের হাড়, কঙ্কাল চুরি করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রই এ অপকর্ম করেছে।"

এ অভিযোগের জবাবে ডঃ শ্যাপিরো বললেন,

"নির্বোধ কোথাকার"।

জাপানের জাদুঘরের ইতিহাস বিভাগে পিকিং ম্যান রক্ষণাবেক্ষনের সার্বিক দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনিই ভাল বলতে পারবেন এগুলো কিভাবে পাচার হয়েছে। অভিযুক্ত ডঃ শ্যাপিরো ও তার সতীর্থরা পিকিং ম্যানের ছবি তুলেছে। এর আয়তন পরিমাপ করেছে। সেভাবেই বাক্স বানিয়েছে। জাদুঘরের কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান করে, কঙ্কালগুলো গবেষণাগার থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করেছেন। এ পুরো ঘটনা ঘটেছে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধের সময়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিল যেখান থেকে পিকিং ম্যানের কঙ্কাল হারিয়ে গেছে সেই গবেষণাগারের অথবা নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের জেরা করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হওয়ায় মাও সেতুংয়ের যুগে যুক্তরাষ্ট্রের কোন শীর্ষ ব্যক্তি চায়নায় প্রবেশের সুযোগ পায়নি। তারপরেও উভয়পক্ষের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভদ্রতাসূচক মতবিনিময় হত। আশার আলো জেগেছিল তাতে। এরই প্রথম ধাপ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক ও বিজ্ঞানী মিস্টার জানুসকে চায়না এ ব্যাপারে প্রাথমিক তদন্তের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিল। তাকে সার্বিক সহযোগিতা করবে এ আশ্বাস দিয়েছিল। এই সূত্র ধরে ডঃ শ্যাপিরোকে যৌথ বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মিস্টার জানুস। আর তাকে শর্ত দেয়া হয়েছিল, পূর্বের কোন তদন্তের কথা জানানো হবে না। ড. শ্যাপিরোর বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নেয়া হবে না। বরং তাকে এ প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, পিকিং ম্যান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে। পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দেয়া হল ঃ

"পিকিং ম্যানের কঙ্কাল এবং হাড় পাওয়া গেলে যিনি এনে দেবেন তাকে ৫ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে।"

এ পুরস্কার ঘোষণার ফলে সৃষ্টি হল নতুন করে জটিলতা। অর্থ যে কথা বলে এটাই তার বড় প্রমাণ। বহু মানুষ ছলচাতুরী, প্রতারণা শুরু করে। এমন বহু মানুষ আছে তথ্য জানা দুরে থাক, পিকিং ম্যানের নামটাই শুনেনি তারাও বিজ্ঞানী সেজে বসল। ৫ হাজার ডলার অর্থের লোভে অনেকেই মিস্টার জানুসের

BanglaBook.org

কাছে ফোন করতে থাকে। তারা জানায়, তাদের কাছে পিকিং ম্যানের হাড় রয়েছে। অবস্থা দেখে মিস্টার জানুস ভালই বুঝতে পারলেন, এভাবে কার্য উদ্ধার হবে না। তিনি অন্য চিন্তা ভাবনা করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন একটি ফোন সবকিছুই পাল্টে দিল। এক অপরিচিত মহিলা ফোনে জানাল,

"আমি নৌবাহিনীর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্ত্রী।"

সে তার কথা বলে যাচ্ছিল। সে বলল,

"তার স্বামী মৃত্যুর ঠিক আগে ফুটলকারের চাবি তাকে দিয়ে যায়। এই ফুটলকারেই রয়েছে কিছু মূল্যবান কঙ্কাল এবং হাড়। সেগুলো চায়না থেকে আনা হয়েছে।"

অপরিচিত এ মহিলার কথা কিছুটা হলেও বিশ্বাস করেছেন মিস্টার জানুস। তার কণ্ঠস্বর প্রমাণ করে, সে অন্তত মিথ্যা বলছে না। পুরস্কারের লোভেও ঐ নৌবাহিনীর স্ত্রী এসব কথা বলছেন না তা ভালই বুঝতে পারলেন মিস্টার জানুস। আরো তথ্য জানার চেষ্টা করলেন জানুস। এ কারণে ঐ মহিলাকে তার সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু অস্বীকার করলেন। বিজ্ঞানী জানুসের মনে হল মহিলা ভয় পাচ্ছে। বিশেষ করে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর পর কণ্ঠস্বর কেমন যেন সরু হয়ে গেছে। কিন্তু কি কারণে, সেটাই বুঝতে পারলেন না জানুস। বাধ্য হয়েই বিভিন্ন স্থানে সাক্ষাতের জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন। এমন কথাও বলেছিলেন,

"যেখানে তার সুবিধা হয় সেখানেই তারা আলোচনায় বসবেন।"

তিনি (ঐ মহিলা) সব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে একটা প্রস্তাবে তিনি সম্মত হন। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের ছাদে বৈঠক হতে পারে। জানুস বলেন,

"আমি আপনাকে চিনব কিভাবে?"

মহিলা বলল,

"আপনাকে আমি চিনে নেব।"

কবে সাক্ষাত হবে এর কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ দিল না। ফোনে আলাপের কিছুক্ষণ পরেই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল। মিস্টার জানুস হতবাক হয়ে পড়লেন। তিনি লক্ষ্য করলেন এলিভেটরের শেষ ধাপটিও পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। আর এলিভেটর থেকে নেমে এলেন চল্লিশর্ধো এক সুন্দরী মহিলা। তার পরিচয় দিল। হ্যান্ডশেক করল। দু'জনে সামনে হাঁটতে থাকে।

BanglaBook.org

জানুস তাকে অনুসরণ করছিল মাত্র। তাদের দিকে বহু মানুষ আড়চোখে তাকাচ্ছিল। অনেকের হাতে ক্যামেরা ছিল। আড়ালে আবডালে ছবি তুলে নিল। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের ছাদের এক কোনায় গিয়ে তারা দাঁড়াল। বহু পর্যবেক্ষক এবং দর্শনার্থী রয়েছে ছাদে। প্রত্যেকে নিজের মত ঘোরাফেরা করছে। মহিলা কোন কথা বলছিল না। এতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন জানুস। পরবর্তীতে তিনি বললেন,

"আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি আমি একাই এসেছি। আমার সাথে কেউ নেই।"

মহিলা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। যেন হাল্কা হল। তারপর কাহিনী বলতে শুরু করে। মহিলা জানাল,

"তার স্বামী মৃত্যুর আগে ফুট লকারের চাবি দিয়ে গেছে। ফুটলকার বাক্সে কি ছিল তা কখনো বলেনি।"

এগুলো যে তিনি লুট করে নিয়ে এসেছিলেন তা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল তার আচরণে। এগুলো সে চায়না থেকে লুট করেছিল। মহিলা ভাবছিল স্বামীর এই অপরাধের জন্য তাকে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ফুটলকারগুলো খুলল। বাক্স খুলে দেখতে পেল বেশ কিছু হাড়-গোড়। তিনি বুঝতে পারছিলেন না স্বামী তাকে কি বিষয়ে বলে গেছে। কেনই বা এসব হাড়ের এত মূল্য। সংবাদপত্রে যখন পুরস্কার ঘোষণা হল, এবং তা পাঠ করার পরই মহিলা বুঝতে পারল তার কাছে কত মূল্যবান বস্তু রয়েছে। বাক্সে পড়ে থাকা হাড়গুলো দেখে নিজের পকেট-বুক বের করল। তিনি সেখান থেকে একটি ছবি বের করল। মহিলার কথা বুঝতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল জানুসের। মহিলা একবারও বলেনি তার স্বামী কিভাবে ফুটলকারগুলো চায়না থেকে নিয়ে এসেছিল। সেগুলো জাহাজে থাকার কথা ছিল। তার হাতে এল কি করে?

জানুসের সব চিন্তা চেতনা যেন বেখাপ্পা হয়ে পড়ছিল। তার মধ্যে হঠাৎ করে মনে হচ্ছে বাক্সের ভিতর কোন মানব দেহের হাড় এবং কঙ্কাল ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রয়েছে। তার মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। তাহলে পিকিং ম্যানের কঙ্কাল, হাড় কোথায় গেল? আদৌ কি এগুলোর কোন সন্ধান পাওয়া যাবে? মহিলার সাথে কোন প্রকার চুক্তিতে যাওয়ার আগে তাকে একটা বিষয় উপলব্ধি করতে হবে যেসব কঙ্কালের হাড়-গোড়ের ছবি দেখাচ্ছেন সেগুলো পিকিং ম্যানের কিনা তা প্রমাণ করার দায়িত্ব তার। শুধু ছবি দেখিয়ে পুরস্কার পাওয়া যাবে না। এ ছবিই এবং বাক্সের ভিতর যেসব হাড় রয়েছে তাই কি যথেষ্ট?

BanglaBook.org

পিকিংম্যানের অস্থিমজ্জা

একটা দিক থেকে হয়তোবা তাই। কিন্তু জানুসের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে তাকেও নীতিগত সম্মত হতে হবে এসব কিছু জানতে হলে তারা যে পুরস্কার ঘোষণা করেছে সেটা দিতে হবে। আর এমতানুসারে জানুসও ঐ মহিলার সাথে সমঝোতার চেষ্টা করছিল। ঐ মহিলার দাবী ছিল পিকিং ম্যানের অস্থি, কঙ্কাল পেতে হলে তাকে ৫০ কোটি ডলার প্রদান করতে হবে। এটা শুধু প্রাথমিক দাবী। এটাই চূড়ান্ত তা ভাবার কোন কারণ নেই। তারপরে তারা খুব ধীরে সুস্থে কথা বলতে থাকেন। জানুস দাম কমাতে চেষ্টা করছিলেন। তাদের কথাবার্তার সময় হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। আলোটা তাদের সামনেই জ্বলল। কে বা কারা, এবং কোথা থেকে আলো জ্বলল তা বোঝা গেল না। মহিলা তাড়াতাড়ি জানুসের কাছ থেকে ছবিটা নিয়ে নিল এবং সেটা একেবারে হাওয়া করে দিল।

মহিলার সাথে দীর্ঘ আলাপচারিতার কথা ড.শ্যাপিরোকে জানালেন জানুস। তারা সিদ্ধান্ত নিল মহিলার কাছে পিকিং ম্যানের যে ছবি আছে সে যদি সত্যি সত্যি পিকিং ম্যানের কঙ্কাল হাজির করতে পারে, এবং তাদের হাতে তুলে দেয় তাহলে দাবীকৃত ৫০ কোটি ডলার প্রদান করা হবে। বৈজ্ঞানিক এবং গবেষক জানুস ভাবছিলেন যদি মহিলার কাছ থেকে আরো কিছু জানতে হয় তাহলে কৌশলে এগুতে হবে। এ বিষয়টি তিনি বুঝতে পারছিলেন। নতুন চিন্তা কাজ করল তার মধ্যে। টাকা প্রদানের আগে মহিলা যে কঙ্কাল এবং হাড় প্রদান করবে তা ড. শ্যাপিরোকে দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেয়া হবে। এমনকি প্রয়োজন হলে অন্যকোন বিজ্ঞানীর পরামর্শ এবং সাহায্য নেবে। কঙ্কালগুলো পিকিং ম্যানের কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার পরই তাকে টাকা দেবে। বহু চিন্তা-ভাবনা করছিলেন জানুস। কিন্তু একটা বিষয় তার মাথাতে আসছেনা কোথায় তার সাথে পুনরায় দেখা হতে পারে। অবস্থা এমন দাঁড়াল, এ পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একদিন দেখা হবে এবং সেজন্য অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে। এভাবে এক মাস পার হল। মহিলা বুঝতে পারল, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের ছাদে বসে জানুস যেসব কথা বলেছিলেন তা কোন প্রতারণা ছিল না। তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেনি। বরং জানুস চেষ্টা করেছিলেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে কাজ সমাধা করতে।

৪ আগস্ট, ১৮৭২, নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার শিরোনামে লেখা হলঃ

"পিকিং ম্যান কঙ্কাল ১ ডলারে বিক্রি হচ্ছে!"

BanglaBook.org

বিস্ময়কর ব্যাপার, ঐ পত্রিকার প্রতিবেদক এ তথ্য কোথা থেকে পেয়েছে তা কারো জানা নেই। সম্পূর্ণ আকাশ কুসুম প্রতিবেদক মাত্র।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার প্রতিবেদকের সাথে কথা বললেন জানুস। প্রতিবেদককে বললেন,

"সত্যি বলতে কি আমি হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম । কিন্তু যখন ঐ মহিলার কাছ থেকে ফোন পেলাম তখন বুঝতে পারলাম পিকিং ম্যান রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব। তাকে আমি একথাও বলেছি, সে যেন এক কপি ছবি পাঠায় যাতে করে আমি পিকিং ম্যানের অস্থি, মজ্জা নিয়ে নির্ভরযোগ্য কোন বিজ্ঞানী বা গবেষককে দেখিয়ে তা পর্যালোচনা করতে পারি। সে কিছুতেই আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারছিল না।"

উপরন্তু সে বলল,

"আমি কেমন করে জানব, অন্য কারো কাছে পিকিং ম্যানের ফসিল, হাড়, কঙ্কাল আছে কিনা এবং তা নির্ভরযোগ্য কিনা।"

সে একটি কথাই বারবার বলছিল,

"ফসিলগুলো লুটের সম্পত্তি। ফলে এগুলো সবাইকে দেখানো সম্ভব নয়।"

এত কিছুর পরও জানুস আশা ছাড়েননি। কারণ একটাই, ঐ রহস্যময়ী নারী শেষ পর্যন্ত তার কাছে একটা ছবি পাঠিয়েছিল। ঐ ছবি তাকে প্রচণ্ডমাত্রায় অনুপ্রাণিত করেছিল। ছবি হাতে পেয়েই জানুস দ্রুত ড. শ্যাপিরোর অফিসে চলে গেলেন। তাকে পিকিং ম্যানের কঙ্কালের ছবি দেখালেন। ছবি দেখে ড. শ্যাপিরো নিশ্চিত হলেন এটা পিকিং ম্যানের কঙ্কালেরই ছবি। তিনি যেন এর মধ্যেই বিজ্ঞানের গন্ধ পেলেন। নিজেকে বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দা ভাবতে শুরু করলেন। ড. শ্যাপিরো বললেন,

"পিকিং ম্যান সম্পর্কে আমার যে চিন্তা চেতনা ছিল এ ছবি দেখে তা আরও দৃঢ় হল। এতে কোন সন্দেহ নেই এটা পিকিং ম্যানের কঙ্কালের ছবি।"

ড. শ্যাপিরো যতটা আগ্রহ দেখালেন বিজ্ঞানীরা ততটাই ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। তারা আগ্রহ প্রকাশ করল না। মহিলার দেয়া ছবিটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন বৈজ্ঞানিক ও গবেষক উইলিয়াম হেওয়েল। তারপর পিকিং ম্যানের কঙ্কালতত্ত্ব নিয়ে মত প্রকাশ করলেন। এ বিষয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার কথা জানালেন তিনি। এদিকে মহিলার মধ্যে ভীতি কাজ করল।

BanglaBook.org

তার শুধু মনে হচ্ছিল পিকিং ম্যানের কঙ্কাল যেহেতু তার স্বামী চায়না থেকে লুট করে এনেছে এবং সে-ই লকার তার কাছে রয়েছে ফলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে। মহিলা শুধু ভাবছিল স্বামী মরে গিয়ে বেঁচেছে। বরং এখন বিপদ তারই। মহিলার স্বামী জীবদ্দশায় পিকিং ম্যানের কঙ্কাল যে বাক্সে রেখেছিল সেগুলো লুকিয়ে রাখতেন। কেউ কখনো জানতে পারেনি কোথায় সেসব অস্থি, মজ্জা, কঙ্কাল, হাড় গেড়ে রেখেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর থেকে যে সব নির্দেশনা পেতেন সেভাবেই কাজ করতেন তিনি। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী কর্মকর্তা পররাষ্ট্র দফতরকে বলেছিলেন,

"কঙ্কাল যেভাবে রাখা হয়েছে তাতে ওগুলোর অস্তিত্ব ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। বাক্সের ভিতরে ভেঙ্গে-চুরে গেছে। আর এ কারণে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে আর কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তাদের কাছে এর কোন মূল্য নেই।"

শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এটাও বলেছিলেন,

"যে মহিলা কঙ্কালগুলো দিতে চাচ্ছেন তিনি অবশ্যই দেশপ্রেমিক। তিনি শুধু তার কর্তব্যই পালন করছেন না, একই সাথে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রকৃত সেবা দিতে যাচ্ছেন। আর এসব পিকিং ম্যানের অস্থি, মজ্জা, কঙ্কাল চায়নার কাছে ফিরিয়ে দেয়াই হবে উত্তম কাজ। সেটাই করা উচিত।"

দুর্ভাগ্যজনক বশতঃ কখনোই তা করা হয়নি। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার কথা শুনে সাময়িকভাবে হতাশ হলেন জানুস। তারপর নব উদ্যমে শুরু করলেন। অন্য কোন বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নিউইয়র্কে বসবাসরত চাইনিজ ব্যবসায়ীর সাথে আলোচনা করলেন। সেই ব্যবসায়ী জানুসকে জানালেন, তিনি তাইওয়ান থেকে এসেছেন। ফুটলকারের বাক্সগুলি নিজে ঠিকমত রক্ষা করতে পারবেন তিনি। আর ঐ ফুটলকারেই পিকিং ম্যানের কঙ্কাল এবং হাড় রয়েছে। তার কথার মধ্যে নতুন শংকা ও ভীতি কাজ করছে। তিনি আরো জানালেন,

"এ বাক্সে ফসিল এবং অস্থি মজ্জা কেউ দেখতে পেলে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়বে। প্রথমে ব্যক্তি পর্যায়ে হলেও পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটবে। সেটাই একমাত্র ভয়ের কারণ।"

জানুস ভাবছিলেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং ভীতি জায়গামত ছড়িয়ে দিতে হবে। যেভাবেই হোক এ কাজ করতে সে ছিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ সম্পর্কে জানুসের জানা ছিল যদি চায়নার সমাজতন্ত্রী সরকারের কোন শীর্ষ কর্মকর্তা যতই

BanglaBook.org

গোপনে বৈঠক করুক কেন্দ্রীয় সরকার ঠিকই তা জানতে পারবে। তাদের দর্শনগত দিক তারা এক ও অভিন্ন। তাহলে পিকিং ম্যান সম্পর্কে যত তথ্যই ঐ চাইনিজ (তাইওয়ানী) ব্যবসায়ী দিন না কেন তিনি সরকারের মাধ্যমেই তা প্রেরণ করেছেন। জানুস তাইওয়ানী ব্যবসায়ীর আশা ছেড়ে দিল। তাইওয়ানী পত্রিকায় সে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, যে কঙ্কাল ফিরিয়ে দিতে পারবে তাকে ১ লাখ ৫০ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। তা ছিল একটা ভুল সিদ্ধান্ত। কেউই বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। এ ধরনের বিজ্ঞাপনের কোন প্রয়োজন ছিল না। উপরন্তু তথ্যগত কিছু ভুল ছিল। আরো একটি বিষয় বলা জরুরি তা হচ্ছে তাইওয়ানের মত পুলিশি রাষ্ট্রে কেউই এ সাহস দেখাবে না যে তার কাছে পিকিং ম্যানের ফসিল রয়েছে এবং সে এ সাহস দেখাবে না যে সেগুলো যুক্তরাষ্ট্র ফেরত দেবে! আর কেউ এ প্রতিশ্রুতি দেবে না যে এসব ফসিল শত্রুর দেশে চায়নার সমাজতান্ত্রিক সরকারের কাছে ফেরত পাঠাবে।

জানুসের শেষ আশাও শেষ হয়ে গেল। তিনি যখন তাইওয়ানী প্রতিবেদকের কাছ থেকে জানতে পারলেন,

"আমি কখনোই চাইনা পিকিং ম্যানের কঙ্কাল সমাজতান্ত্রিক চায়নার কাছে পৌঁছাক। তাদের হাতে গেলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

এর ফলে জানুসের স্বপ্ন নসাৎ হয়ে গেল। তার ইচ্ছা ছিল পিকিং ম্যান কঙ্কাল চায়নার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। কূটনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে এটা অন্তত পরিস্কার, পিকিং ম্যান নিয়ে তাইওয়ানের সাথে আলোচনার কিছু নেই। এভাবেই সময় পার হচ্ছে। নৌবাহিনীর কর্মকর্তার স্ত্রী যেহেতু কোন সাড়া শব্দ করছে না, কোন কিছুই জানাচ্ছে না, ফলে জানুস নিজে থেকেই ঝুঁকি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেট এফবিআইয়ের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নিলেন। এফবিআই কর্তৃপক্ষ নৌবাহিনীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করল। তারা বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করল। ঐ বিশেষ প্রতিনিধির কাজ ছিল ঐ মহিলার কাছ থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিশেষ গোয়েন্দা এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত কোন তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। জানুস দেরি না করে নৌবাহিনীর বিশেষ ক্যাম্প হলোক্যাম্পে গিয়ে সেখানে শীর্ষ প্রধানের সাথে সাক্ষত করেন। নৌবাহিনীর প্রধানও তাকে বড় ধরনের কোন

BanglaBook.org

আশ্বাস দিতে পারেনি। কোন সাহায্য করতে পারবে এমন আশা-ভরসাও কম। অবশেষে তাকে নৌবাহিনীর সাবেক এক কর্মকর্তা বলেন,

"পিকিং ম্যান বহু আগেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে। চায়নারা দীর্ঘদিন ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে কঙ্কালগুলো টিকিয়ে রেখেছিল। ফসিলগুলো হয়ত পাওয়া যেতে পারে কোন ঔষধের দোকানে। তাও বিচ্ছিন্ন হাড়-গোড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। এ সংক্রান্ত কিছু পৌরণিক কাহিনী রয়েছে। যা অধিকাংশ রহস্যময়। পিকিং ম্যানকে কবরে পাওয়া যেতে পারে। সেখানে অস্থি, কঙ্কাল রয়েছে। তবে সেগুলোও চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।"

নৌবাহিনীর কর্মকর্তার কথা শুনে জানুস এবং ড. শ্যাপিরো কেউই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। এটা বাস্তব অর্থে কোন সমাধানের পথ হল না। তাই বলে তারা হাল ছেড়ে দিতে পারেন না। এজন্য তারা প্রস্তুত নয়। এটা প্রত্যেকেই জানে পিকিং ম্যানের কঙ্কাল চায়না থেকে লুট করা হয়েছে এবং একদিন অবশ্যই পাওয়া যাবে। বাক্সের সন্ধান মিলবে।

মহিলা যে চিরতরে হারিয়ে গেছে তার উপরও আস্থা হারাননি জানুস। তার বিশ্বাস একদিন ঐ মহিলার দেখা পাবেন তিনি। দেখতে দেখতে তিন বছর পার হল। স্রোতের মত পার হয়ে গেছে সময়। একদিন জানুস আপন মনেই বলল,

"পুরো বিষয় রহস্যই থেকে গেল কিন্তু আমার বিশ্বাস ঐ মহিলাই হয়তো পিকিং ম্যান ছিলে॥

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মা এবং বাবা হত্যা

বহু বছর আগের কথা। জোড়া খুন হয়েছিল ম্যাসাচুটসের ফল রিভারে। নৃশংস সে ঘটনায় ম্যাসাচুটসবাসী হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কেন ও কি কারণে এ হত্যাকাণ্ড তা কেউই কখনোই জানতে পারেনি। এ রহস্যের জট কোনদিন উদ্‌ঘাটিত হয়নি। আটলান্টিক মহাসাগরের বহু জল গড়িয়ে গেছে, বহু মত, দর্শন উঠে এসেছে। কিন্তু সবই গরল ভেল। নারকীয় সে হত্যাকাণ্ড আজও ম্যাসাচুটসবাসীকে বিস্মিত করে। সে ঘটনাকে নিয়ে পরবর্তীতে ছড়া, গান রচিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের ছোট্ট শিশুরা আনন্দ ফূর্তি করে আর সে-ই গান গায়। দারুণ এক ছন্দ তৈরী হয়েছে। চার লাইনের সেই ছড়াগানের মধ্যেই এক ধরনের অপরাধের কথাই যেন বারবার বলা হচ্ছে।

৪ আগস্ট, ১৮৯২-তে ছড়াগানের পংক্তিগুলো তৈরী হয়েছিল। কোন এক ছড়াকার রচনা করেছিলেন এ গান। তিনি নিজের ভাবেননি শিশুদের হৃদয়ে এতটাই প্রভাবিত হবে।

ছড়াটি ছিল–

'কুড়াল হাতে তুলে নিল লিজি বরডেন
তারপর তার মাকে করল চল্লিশ টুকরা
হৃদয়ে হল তার রক্তক্ষরণ
একি করল সে
ভাবছিল নিজের মনে
তারপর বাবাকেও করল একচল্লিশ টুকরা।'

বর্তমান সময়ে বহু গান রচিত হয়। এমনকি শিশুদের জন্য ছড়াগানেরও অভাব নেই। কিন্তু এ গানের আবেদন এবং মহত্ব শিশুদের কাছে কোনদিন ফুরিয়ে যায়নি। শিশুরা আপন মনে গানটি গেয়ে থাকে। তারাও এর রহস্য বোঝে তা নয়। এ গানের মধ্যেই সব রহস্য লুকিয়ে আছে। যেন সঠিকভাবে তথ্য উঠে আসেনি। একটা বিষয় পরিস্কার, যে মহিলা খুন হয়েছেন তিনি হচ্ছে অ্যাবি বরডেন। তিনি লিজি বরডেনের আপন মা নয়। সৎমা। তাহলে কি এ প্রশ্ন উঠতে পারে সৎমায়ের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে লিজি তাকে হত্যা করেছে? এ নিয়ে শুরু হল ব্যাপক গবেষণা। হার্ভার্ডের মনস্তাত্ত্বিক কেন এবং কি কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটল তা খুঁজে বের করতে চিকিৎসক, আইনজীবী, গোয়েন্দা

BanglaBook.org

কর্মকর্তা সহ মোট এক ডজন বিশেষজ্ঞ ব্যাপক তদন্ত চালাল। প্রাথমিকভাবে লিজিকে সন্দেহ করা হলেও ম্যাসাচুটসের আদালত তাকে নিদোষী সাব্যস্ত করে এবং তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়ায়। এ রহস্যজনক হত্যার কোন সমাধান হয়নি। পুলিশ যথাসম্ভব তথ্য ফাইল করল। লিজির আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নিল তারা। গোয়েন্দারা একটি বিশেষ বিভাগ খুলল এবং খুনীকে অনুসন্ধান করতে থাকে। কিন্তু লিজি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় যেটুকু জানা যায়, অপরাধী ও খুনীকে খুঁজতে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। তাদের কর্মকাণ্ডে ঢিলেমি ভাব চলে আসে। গোয়েন্দাবিভাগও কোন চেষ্টা করেনি। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে সরকারী পক্ষের কৌশলী চাইবে এ মামলা যে বাতিল করে দেয়া হয়। কারণ তিনি যখন বুঝতে পারবেন সন্দেহভাজন প্রধান আসামী নির্দোষ এবং কোন অপরাধের সাথে জড়িত নয়, তখন তিনি স্বাভাবিক ভাবেই এ মামলা চালাবেন না। তারপরেও সরকারী পক্ষের কৌশলী বিচারক মণ্ডলীকে মামলা পরিচালনা করতে প্রভাবিত করে হয়তো চেষ্টা করবেন। তার দ্বিতীয় পন্থাই সঠিক। প্রথম পন্থা হিসেবে সমঝোতার পথ বেছে নেয়া ছিল ভুল।

এ পৃথিবীতে যে সব অপরাধের সমাধান হয়নি তার থেকেও ফল রিভারের হত্যাকাণ্ড অনেক বেশী বিতর্কিত, অন্য সব ঘটনা থেকে পৃথক। যাকে প্রধান আসামী হিসাবে সন্দেহ করা হয়েছিল সেই হচ্ছে লিজি বরডেন যখন আদালত থেকে নির্দোষ হিসাবে মুক্তি পেয়ে যায়, তখন আর কাকেই বা এ ঘটনার জন্য দায়ী করা যেতে পারে? আদালতেরই বা কি করার আছে? কারণ আইন চলে প্রমাণের ভিত্তিতে। ঝানু আইনজীবী আর আনাড়ী তদন্ত কর্মকর্তা পুরো ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করল।

মজার ব্যাপার, তদন্ত কর্মকর্তারা প্রাণপণ একটা সমাধানের পথ বের করার চেষ্টা করছিল। আইনের মারপ্যাঁচে মুক্তি পেলেও লিজিকে নিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সন্দেহ থেকেই গেল। আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক কেউই লিজির স্বাভাবিক মুক্তি মেনে নিতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে লিজি রহস্যময়ী এবং ভৌতিক নারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। সে তার বাবা-মাকে হত্যা করেছে, এরকম নৃশংস অপরাধের কথা কখনো ভুলা যায় না। তার আচরণে এটাই মনে হয়, সে যেন বাবা-মাকে হত্যা করতে ওয়াদাবদ্ধ ছিল। কিন্তু কেনই বা সে এমন নিষ্ঠুর কাজ করেছে। তার বাবা কি তার প্রতি কোন অবিচার করেছে? তার সৎমা তাকে কি কোন নির্যাতন করেছে? এর কোন প্রমাণ মেলেনি। আর এটাও সত্য লিজি তাদের হত্যা করেছে এরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পুরো বিষয়টিই রহস্যময় থেকে গেছে। ঘটনাটি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছিল।

BanglaBook.org

১৮৮৯ সালে আঁকা লিজি বরডেনের ছবি

১৯৭৫ সালের বসন্তকালে ম্যাসাচুটস টেলিভিশনে নতুন করে যেন এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার থেকে লিজিকে আবারও দোষারোপ করা হল। যতবার এ কাহিনী প্রচারিত হয়েছে, প্রতিটি প্রজন্ম যতবার শুনেছে, তারা কেউই লিজিকে ক্ষমা করতে পারেনি। ম্যাসাচুটসের ফল রিভার এলাকার পুলিশ লিজিকে গ্রেফতার করেছিল কারণ সে-ই ছিল সন্দেহভাজনের তালিকায় প্রধান আসামী, তৎক্ষনিক তদন্তে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তদন্তে তার অপরাধ ধরা পড়েছিল। বিশেষ করে তার বক্তব্য ছিল একেবারে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ অসংলগ্ন কথাবার্তার জন্য আদালত থেক তাকে মনস্তাত্ত্বিকের কাছে পাঠাতে নির্দেশ দেয়া হল। সেটাই করা হল। মনস্তত্ত্ববিদগণ তার কথাবার্তা শুনে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। হতে পারে লিজি অপরাধী, আদালত যেহেতু তাকে নির্দোষ হিসাবে রায় দিয়েছে এবং সে মুক্তি পেয়েছে তাহলে প্রশ্ন জাগে লিজি তার বাবা অ্যান্ড্রু এবং সৎমা অ্যাবিকে হত্যা না করে এ জঘন্য ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড কে ঘটিয়েছে? সন্দেহের তালিকা প্রসারিত করা যায় বটে। এ তালিকায় লিজির চাচা জন মর্সের নাম আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ফল রিভারের পুলিশ ও গোয়েন্দারা জন মর্সকে প্রথম থেকেই সন্দেহ করছিল। তাদের ধারণা এ হত্যাকাণ্ডের সাথে তার জড়িত থাকার সম্ভাবনা বেশি। গৃহপরিচালক ব্রিজেট সুলিভানকেও সন্দেহ করা হল। সেও হয়তো তার মালিককে খুন করতে পারে। জোড়া খুনের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে সে। আরো একজনকে সন্দেহ করা হচ্ছে, সে অবশ্য তরুণ এক অপরিচিত আগন্তুক, ঐদিন বরডেনের বাড়িতে এসেছিল। যাকে পুলিশ বাড়ির পাশে গাছে ঝুলে থাকতে দেখেছে। সে হয়তো খুন করতে পারে। ঐ ঘটনার পর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, পুলিশের পক্ষে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি তাহলে আর বাকী থাকল কে? গোয়েন্দা বিভাগ অনুসন্ধান করছে, এন্ড্রুর শত্রু থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। যেহেতু সে বিত্তশালী এবং প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক ধিরায় তার প্রতিপক্ষ থাকতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কে বা কারা, তার শত্রু হতে পারে? সে ব্যাপারে। পুলিশের কোন ধারণা নেই। অর্থ সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে এটা কোন অসামঞ্জস্য ব্যাপার নয়, এন্ড্রু বরডেনকে কেউ ঘৃণা করবে না। তার শত্রু থাকবে না, এটা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। ফল রিভার সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত অধিবাসীদের হয়ত এমন কেউ আছেন যিনি এন্ড্রু বরডেনের প্রধান শত্রু। সেটা অবশ্য চিরকাল আড়ালেই থেকে গেল।

BanglaBook.org

এন্ড্রু বরডেনের বাল্য ও কৈশোর জীবন সুখকর ছিল না। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান তিনি। অভাব এবং দারিদ্রের মাঝে বড় হয়েছেন। মাছ বিক্রেতার সন্তান তিনি। ছোটবেলায় একটি রাসায়নিক কারখানায় কাজ করতেন। মমি তৈরির কারখানায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করতেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং চালাক ছিলেন। কিভাবে সম্পত্তির মালিক হতে হয় সেটা ছোট বয়সেই বুঝতে পেরেছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দু'হাতে অর্থ উপার্জন করতে থাকেন। এভাবেই একদিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাংকের সভাপতি হন তিনি। ম্যাসাচুটসে প্রচুর জমি ক্রয় করেন। ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। মিলেরও মালিক হন তিনি। আচার-আচরণে এন্ড্রু বরডেন খুবই অমায়িক ছিলেন। তার কোন শত্রু থাকতে পারে এটা কল্পনাই করা যায় না। তিনি সব সময় কালো পোষাক পরিধান করতেন। আর একটি বিষয়, যে কোন ব্যাপারে প্রতিপক্ষের সাথে সমঝোতা করতেন অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে। বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত লেনদেনে এন্ড্রু বরডেন ছিলেন অত্যন্ত পাকা খেলোয়াড়।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে বরডেন পাঁচ লাখ ডলারের ব্যবসায়িক চুক্তি করেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধি এবং জ্ঞান ছিল তার। এন্ড্রু প্রতিপক্ষ যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহজেই ঘায়েল করতে পারতেন তিনি। খুব সহজেই মিলের মালিক হলেন। এছাড়াও তিনি যাদের ঋণ দিতেন তারা যদি সময়মত অর্থ পরিশোধ করতে না পারত তাহলে জোরপূর্বক তাদের সব সম্পত্তি দখল করে নিতেন। এভাবে কতজনকে তিনি নিঃস্ব করেছেন, তার কোন হিসাব নেই। তার নির্মম মৃত্যুতে ফল রিভারের অনেকেই বিন্দুমাত্র দুঃখ ও কষ্ট পায়নি। বরং অনেকে এমন আচরণও করেছে, এ ঘটনা এত দেরীতে কেন ঘটল, তাতেই তারা বিস্মিত। অনেকেই এন্ড্রুর মৃত্যুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। তার স্ত্রীর হত্যাকাণ্ড অংশত যেন তারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। ফল রিভারবাসী এন্ড্রুর স্ত্রী অ্যাবিকে ভাল মানুষ হিসেবেই জানত। অত্যন্ত সাধারণ মহিলা ছিলেন তিনি। তার কোন ক্ষমতা ছিল না। তাকে কেন হত্যা করা হল এটাই অনেকে ভেবে পায় না। চলাফেরায় খুবই সাধারণ ছিলেন অ্যানি বরডেন। খুব কম সময়ই বাড়ির বাইরে যেতেন। তার কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না। আড্ডা দিয়ে সময় কাটাবেন, সে ব্যাপারে কখনো কোন আগ্রহ ছিল না। বলতে গেলে নিজস্ব কোন জগত ছিল না। সংসারে জন্য পরিশ্রম করেই দিনাতিপাত করতেন। তার কাজ ছিল একটাই বাড়ি-ঘর গুছিয়ে রাখা। সবার পরিচর্যা করা আর অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া করতেন।

BanglaBook.org

লিজির সৎমা এ্যাবি বরডেন

পাঁচ ফুট লম্বা অ্যাবি বরডেন প্রায় ২০০ পাউন্ডের মত ওজন নিয়ে চলাফেরা করতেন। বর্তমান সময়ের কোন কুস্তিগীর তাকে দেখতে পেলে হয়তো অবাক হয়ে যেত। খাওয়ার ব্যাপারে কোন কিছুতেই তার অরুচি ছিল না। কোন দুশ্চিন্তা তার মধ্যে কাজ করত না। কোন ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত হত না। সবার মনে এই প্রশ্ন জাগে, অ্যাবি বরডেন তার বিশাল শারীরিক শক্তি নিয়েও কেন তার উপর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না। তাহলে আক্রমণকারী তাকে কুড়াল দিয়ে পিছন থেকে আঘাত করেছিল। সেটারই সম্ভাবনা বেশী। এটা ঠিক অ্যাবিকে নিয়ে কারো কোন অনুভূতি ছিল না। তার প্রতি কারও কোন রাগ বা ক্ষোভও ছিল না। তা থাকারও কথা নয়। এর ফলে সব সন্দেহ এসে যায় লিজি বরডেনের প্রতি। সাক্ষ্য প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, লিজি তার সৎমা অ্যাবি বরডেনকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত। প্রত্যেকে এটাও প্রকাশ করেছে, দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক একেবারে তিক্ত পর্যায়ে, পৌঁছে গিয়েছিল।

লিজি বড় হয়ে জানতে পেরেছিল অ্যাবি বরডেন তার সৎ মা। বরং লিজি ছোটবেলা থেকে জানত অ্যাবি তার মা। আপন বা সৎ বলে কোন শব্দ তার অভিধানে ছিল না লিজির বয়স যখন দু'বছর তখন তার আপন মা মারা যায়। আর সে সময় তার বড় বোন এমার বয়স ছিল বার বছর। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পর অ্যান্ড্রু বরডেন বিয়ে করেন অ্যাবিকে। ফল রিভারবাসী ভেবেছিল অ্যাবি খুবই ভাগ্যবতী। নীতিগতভাবে এ বিয়ে সমর্থন করেছিল। ত্রিশ বছর তাদের দাম্পত্য জীবনে কখনো কোন সংঘাত বা দ্বন্দ্ব হয়েছে এমন কোন নজির নেই। সুখে শান্তিতে সংসার করেছে তারা। সময়ের সঠিক বিচার ও বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণিত হয় অ্যান্ড্রু বরডেন তার স্ত্রী অ্যাবির সাথে সুন্দর মত বৈবাহিক চুক্তি সম্পাদন করেছেন। অ্যাবি সংসারের সব দায়িত্ব পালন করত। এন্ড্রুর জন্য রান্না করত। চেষ্টা করত সুস্বাদু খাবার তৈরি করতে। বাড়ি-ঘর পরিপাটি করে রাখতে। এন্ড্রুর দু'মেয়ের দেখভাল করত। সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি রাখেনি অ্যাবি। অর্থের ব্যাপারে সতর্ক ছিল সে। কখনোই স্বামীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করত না। কোন প্রশ্ন করে তাকে বিপদে ফেলত না। অ্যাবি তার সীমা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। সীমার বাইরে কখনো সে যায়নি। এন্ড্রু তার দীর্ঘ ৩০ বছরে বিবাহিত জীবনে কখনোই অ্যাবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেনি। কোন দোষারোপ করেনি।

অ্যাবি খুব সুন্দর শাক-সব্জি রান্না করত। এতে খুবই আনন্দ পেত বড় মেয়ে এমা। এমনকি শাক-সব্জির বাগান করেছিল সে। এ্যাবির প্রতি এমা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিল ছোট মেয়ে লিজি। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল এমা যেন অ্যাবির হুবহু কার্বন কপিতে রূপান্তরিত হয়ে

BanglaBook.org

পড়েছিল। সে তার মাকে অনুসরণ করত। আর ছোটবোন লিজিকে মায়ের মত স্নেহ করত। দু'জনের বয়সের পার্থক্য ছিল ১০ বছর। যেহেতু লিজি ২ বছর বয়সী তাই তাকে মায়ের অভাব বুঝতে দিত না এমা। আদরে তাকে লালন পালন করেছে। স্নেহ ভালবাসা সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে। যেদিন দু'বোনের বাবা-মা মারা গেল সেদিন এমার বয়স ছিল ৪২ বছর। সে বিয়ে করেনি। বিয়ে করতেই হবে, এটা মোটেই পছন্দ ছিল না এমার। তার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ছিল এবং তার সৎ মায়ের সাথে সুন্দরভাবে দিন যাপন করছিল।

লিজি ছিল পুরোপুরি ব্যতিক্রমধর্মী। কিছুটা রাগী, বদমেজাজী বলা যায়। সবকিছু নিজের দখলে নেয়ার চেষ্টা করত। বিশাল দেহের অধিকারী। চেহারায় কোন আকর্ষণ ছিল না তার। ছিল সেও অবিবাহিত। কোন পুরুষ তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করত না। বাবা মায়ের মৃত্যুর সময় তার বয়স ৩২ বছর। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত লিজি। তার পোশাক পরিচ্ছদে ছিল পরিপাটি। অবিবাহিত হলেও সারাদিন সে বাসায় বসে থাকত না। বরং সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকতেই পছন্দ করত সে। আর তার প্রচুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সবচেয়ে বড় গুণ ছিল মানুষকে যতটা সম্ভব উপকার করা। মানুষকে ভালবাসত সে। তার মধ্যে যে বিষয়টি সবাইকে আকৃষ্ট করত তা হচ্ছে গীর্জায় সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত; লিজি স্বেচ্ছা শ্রম দিতে পছন্দ করত। এ কাজ যে শুধু গীর্জাতেই করত তা নয়। প্রতিটি স্তরে, সুযোগ পেলেই মানুষের কল্যাণে সে নিজেকে সঁপে দিত। আর এ কারণেই মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল সে। বিপরীত দিকের চিন্তাও তার মধ্যে কাজ করত। দরিদ্র এবং হতভাগ্য মানুষের জন্য প্রচুর সমাজ সেবামূলক কাজ করেছিল লিজি। আর তাই লিজি গ্রেফতার হলে ফল রিভারের অনেকে হতবাক হয়েছে। তারা মেনে নিতে পারেনি।

লিজির অবস্থা কি জেকিল এন্ড হাইডের মত হল? তার অনেক বন্ধু ছিল। তাকে উপকার করতে অনেকেই এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু অনেকেই তার গোপন বিষয়টি জানত না। যারা এ ঘটনা পরবর্তীতে জেনেছিল এবং কারো কাছ থেকে শুনেছিল তারা কেউই লিজিকে দোষারোপ করতে পারেনি। এটাও নিশ্চিত করে বলা যায়, লিজি যা ভাবত তা করতে দ্বিধাবোধ করত না। আর এ কারণেই হত্যাকাণ্ড ঘটার পাঁচ বছর আগেই কুড়াল নিজের কাছে রেখে দিত সে। সে-ই কি তার বাবা এবং সৎ মায়ের প্রকৃত খুনী? এটা কখনোই প্রমাণ হয়নি। রহস্যই থেকে গেছে।

অ্যান্ড্রু এবং অ্যাবি বরডেনের হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হলে একটু পিছনে যেতে হবে। এন্ড্রুর ব্যবসায়িক জীবন এবং তার অর্থ উপার্জনের পথ কি স্বচ্ছ ছিল? সেটাই মূল আলোচনার বিষয়। ১৮৮৭ সালে এন্ড্রু বরডেন

BanglaBook.org

রিয়াল এস্টেটের ব্যবসায় শুরু করে। ভূমি ব্যবসা করতে গিয়ে অনেকের সাথে তার শত্রুতা হয়। ব্যবসায় শুরুর আগে তিনি তার প্রথম স্ত্রীর ভাই জন মর্সের সাথে বিষয়টি আলোচনা করেন। জন মর্সকে তিনি বিশ্বাস করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তাকে ছাড়া আর কাউকে জানাতেন না। জন মর্সও তার প্রতি বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছিল। রিয়াল এস্টেটের ব্যবসা করার সময় এন্ড্রু একটি বাড়ি কিনেছিলো। সংগত কারণেই নিজের জন্য বাড়ি কিনেছিলেন তিনি। অবশ্য বাড়িটি অ্যাবির নামে দলিল করেন। বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। ব্যবসায়িক কোন চুক্তি করলে সেটা যতটা সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করতেন এন্ড্রু বরডেন। খুব কম লোকই তার ব্যবসায়ের কথা জানতে পারত। কেউই জানতে পারেনিকোন কোন খাতে তিনি কি পরিমাণ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছিলেন? তার সমগ্র জীবনে বিশেষ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনায় কত টাকা বিনিয়োগ হয়েছিল তা গোপন ছিল। এর অন্যতম কারণ সে ভাবত তার দু'মেয়ে হয়তো চিন্তা করতে পারে তাদের বাবা স্ত্রী অ্যাবিকে বেশি ভালবাসেন। সেজন্য টাকা পয়সার কথা কাউকে বলতেন না। এন্ড্রু কখনো অ্যাবিকে অর্থ সম্পত্তি বিষয়ে কোন কিছু জানাবে এটা বিশ্বাস করাও কঠিন ছিল। তাকে যেটুকু সম্পত্তি দেয়া প্রয়োজন সেটুকু আগেই দলিল করে লিখে রেখেছিলেন। একথা ঠিক যে দু'বোন এমা এবং লিজি ছাড়া কেউই জানত না যে অ্যাবি হচ্ছে তাদের বাবার রক্ষিতা। নামেই মাত্র স্ত্রী। এর বেশি কিছু নয়।

একটা পর্যায়ে এসে দু'বোন ভাবতে থাকে বাবা তাদের প্রতি অবহেলা করছে। ন্যায্য দাবী দাওয়া মিটাচ্ছে না। তাদের মনে হল সৎ মা সব কলকাঠি নাড়াচ্ছে। সে সব সম্পত্তি দখল করতে চাচ্ছে। এটা এমা ও লিজির বড় ভুল ধারণা বটে। যখন কোন গোপন তথ্য বেরিয়ে আসে আর সেটা যদি হয় অর্থ সম্পদের ব্যাপার তাহলে ভীত হয়ে পড়ে দু'বোন। দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে অনেকেই হিংস্র হয়ে উঠে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে এমা ও লিজির মধ্যে। এমা প্রায়ই তার মায়ের ওপর রেগে যেত। আর লিজি যেন বাবা মা দু'জনকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে মা অ্যাবিকে দোষারোপ করতে থাকে সব বিষয়েই। তার বিরুদ্ধে লিজির অভিযোগ, সে তার বাবাকে ফাঁদে ফেলেছে। শুধু মাত্র সম্পত্তির লোভে অ্যাবি এ কাজ করেছিল। এমনকি লিজি তার মামা জন মর্সের প্রতি রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। তার মামার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, সে এমা এবং লিজির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। এন্ড্রু যে এসব জানতেন না তা নয়। তিনি বরফের মত স্থির থাকতেন। পরিস্থিতি শান্ত রাখার চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে দু'মেয়েকে কোনভাবেই উত্যক্ত করতেন না। অ্যাবিকে মা বলে সম্বোধন করা থেকে বিরত থাকে লিজি। কোন কিছুর ব্যাপারে অ্যাবিকে উল্লেখ করলে তার দিকে শুধু অঙ্গুলি নির্দেশ করত লিজি। চুপ করে থাকত। বড় জোর মিসেস বরডেন বলে সম্বোধন করত। এর বেশি কিছু নয়।

BanglaBook.org

এতেই প্রমাণিত হয় অ্যান্ড্রু এবং অ্যাবির প্রতি লিজির প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল এবং সে কারণেই দু'জনকে লিজি হত্যা করেছিল।

দু'বোনের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, অ্যাবিকে কখনোই মা বলে সম্বোধন না করা, এসব কিছু লিজি নিজের প্রতি যেন প্রতিশোধ নিয়েছিল চার বছর ধরে। এরই মধ্যে ছোটখাট অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এন্ড্রু বরডেনের বাসায় ডাকাতি হয়। অ্যাবির স্বর্ণের চেইন, দামী ঘড়ি, বেশ কিছু হার এবং কয়েক'শ ডলার চুরি হয়েছিল। আলমারি তালা দিয়ে রাখতেন এন্ড্রু। চাবি গোপন স্থানে রেখে দিতেন। চুরির ঘটনা এন্ড্রু বরডেন পুলিশকে জানিয়েছিলেন বটে তবে ফল রিভারবাসী যেন জানতে না পারে সেজন্য পুলিশকে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। ফল রিভারবাসী কোনদিনই জানতে পারত না যদি না লিজি তার বন্ধু-বান্ধবকে এ ঘটনা জানাত। সে-ই চুরির ঘটনা লিজি জানিয়েছিল বাবা-মা খুন হওয়ার আগের দিন। বাবা-মা যখন বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল তখন চুরির হয়েছিল। খুবই কম সময়ে এন্ড্রু তার স্ত্রী অ্যাবিকে নিয়ে বাইরে যেতেন। বাড়ি তালা দিয়ে দু'জনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফলে ভিতর থেকে যেমন কেউ বের হতে পারবে না তেমনি বাইরে থেকে কারো প্রবেশের সুযোগ কোন নেই। এন্ড্রু বাইরে তালা দিয়ে প্রধান ফটক বন্ধ করে দিতেন। সে তার দু'মেয়েকে ঘরে বন্দী করে রাখতেন। এ ঘটনা ফল রিভারবাসী কখনই জানতে পারেনি। লিজির শত্রুরা বহু চিন্তাভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে আসে, বাড়িতে যে চুরি সংঘটিত হয়েছে তা লিজিই করেছে, এন্ড্রু এটা বুঝতে পেরেছিলেন আর সে কারণেই পুলিশকে অপরাধী খুঁজতে বারণ করেছিলেন। ঘটনা এখানেই ধামাচাপা দিতে চাইলেন।

লিজিকে তার বাবা যেহেতু কোন প্রকার শাসন করেনি আর সে কারণেই তার সাহস অত্যাধিক বেড়ে গিয়েছিল। প্রথম ঘটনার পর দ্বিতীয় অপরাধ করতে তার আর বাধা থাকল না। অতি দ্রুত সে দু'টি ঘটনা ঘটায়। একই সময়ে দু'টো অপরাধ করেছিল। প্রথমটি বাবার রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়ের গোপন তথ্য জেনে ফেলেছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল খুবই ভয়াবহ। তার সৎ মা অ্যাবিকে বিষপানে হত্যা করতে চেয়েছিল। আর এ কারণেই এন্ড্রু বুঝতে পেরেছিল তার দু'মেয়েকে নিয়ে বড় ধরনের জটিলতায় পড়তে যাচ্ছিল সে। কোন কিছুর সাথেই লিজির এ অপরাধ মিলাতে পারছিলেন না তিনি। কেন লিজি এরকম করছে তার কোন হদিস করতে পারেননি এন্ড্রু। সব কিছুর বিনিময়ে তিনি শান্তি চেয়েছিলেন। তবে মেয়েদের এ আচরণে তার মধ্যেও সন্দেহ সৃষ্টি হল। আর সেজন্যই স্ত্রী অ্যাবির নামে সম্পত্তির কিছু অংশ রেখেছিলেন। জন স্বয় ছাড়া আর কেউই এ বিষয়টি জানত না। ধারণা করা হয় লিজি কোনভাবে এ ঘটনা জেনে ফেলেছিল। তাতেই তার যত রাগ, ক্ষোভ, দানা বেঁধে উঠে। বাবা-মাকে হত্যার পরিকল্পনা করে সে। অ্যাবিকে কোনভাবেই সম্পত্তি দেয়া যায় না সেজন্য হত্যার প্লট তৈরী করে।

BanglaBook.org

লিজির বাবা অ্যান্ড্রু বরডেন

জোড়া খুনের ঠিক দু'সপ্তাহ আগে লিজি ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরি থেকে এসিড কেনার চেষ্টা করে অবশ্য ব্যর্থ হয়। কেন সে এসিড কিনতে চায় তা ফার্মাসিস্টকে ঠিকমত জানাতে পারেনি, এবং এসিড কিনতে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন হয় সেটা দেখাতে পারেনি লিজি। তার বিরুদ্ধে আরো একটি রেকর্ড উত্থাপিত হয়। অ্যান্ড্রু এবং অ্যাবি হত্যার ঠিক আগের দিন ৩ আগস্ট অ্যাবি ডাক্তারের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে, তাকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রমাণস্বরূপ অ্যাবি জানাল, ঐ রাতে তার বাসায় যারা খাবার খেয়েছে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এমনকি লিজিও অসুস্থ হয়েছিল। ফলে একথা বলা যায় না, লিজি তাকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। অ্যাবির একান্ত ব্যক্তিগত চিকিৎসক ব্রাউন এ অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নেয়নি। চিকিৎসক ব্রাউন তাকে জানাল, হিট ওয়েভের কারণে এবং খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে সবাই অসুস্থ হয়েছিল। এটা এমন কিছু নয়। আশ্চর্যজনকভাবে হলেও সত্য চিকিৎসকের এ ধারণার সাথে একমত পোষণ করেনি লিজি।

সে ঐদিন বিকালে বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল এবং তাকে বলেছিল,

"আমার ধারণা কেউ বাড়ির সবাইকে হত্যা করতেই খাবারে বিষ মিশিয়েছিল।"

লিজির বিশ্বাস ছিল কোন এক রহস্যময়ী পুরুষ, ঘাতক সেজে তাদের বাসায় প্রবেশ করেছিল। তাদের সবাইকে হত্যা করতে চেয়েছিল। লিজি মনে করত, ব্যবসায়িক কারণে বাবার অনেক শত্রু ছিল। তাদের কেউ একজন বাবার উন্নতি সহ্য করতে না পেরে পুরো পরিবারকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল। বাড়িতে চুরির কথা প্রথমবারের মত লিজি সবাইকে বলেছিল। চুরির ঐ ঘটনা ঘটেছিল বাবা মায়ের হত্যাকাণ্ডের এক বছর আগে। প্রকৃত অর্থে ঐ চুরির ঘটনা এবং সর্বোপরি এন্ড্রু ও অ্যাবির খুনের পরিকল্পনা একই সূত্রে গাঁথা। এসবই লিজির নিজস্ব পরিকল্পনা কিনা সেটাও বিচার্য বিষয়।

৩ আগস্ট, ১৯৮২ তে বরডেনের বাসায় যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল তারই জের নামল পরেরদিন। ঐ দিন সকাল থেকেই আকাশ যেন বিষণ্ন ছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। অবশ্য বরডেনের বাসায় সবকিছুই অন্যদিনের মতই স্বাভাবিক ছিল। এন্ড্রু বরডেন তার দোতালা থেকে সকাল ৯ টায় নিচ তলায় নেমে এলেন। সকাল থেকেই ঘর গোছ-গাছে লেগে গেল অ্যাবি। সে নিয়মিত সকালেই ঘুম থেকে উঠে। নিজের কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন সে।

লিজি সকালেই খাবার টেবিলে গেল। মায়ের সাথে শুভ সকাল বিনিময় করল। যতটা সম্ভব ভদ্র এবং নম্র ব্যবহার করল সে। আগের রাতের খাবারে

BanglaBook.org

বিষক্রিয়ার কারণে তখনও অসুস্থ বোধ করছিল লিজি। গৃহকর্মী ব্রিজেট অসুস্থ। পুরো বাড়িঘর পরিষ্কার করল অ্যাবি। জানালাগুলো সুন্দরভাবে মুছল। ব্রিজেট হাল্কা কিছু নাস্তা করে কাজে চলে গেল। এমা গতরাতে বাসায় ফেরেনি। বন্ধুদের বাসায় রয়েছে। এভাবে দিনটি শুরু হল। পুরো বাড়িতে অ্যাবি এবং লিজিই রয়েছে।

প্রতিবেশীরা লক্ষ্য করল একজন আগন্তুক বরডেনের বাসার সামনে হাঁটা-চলা করছে। কে এ ব্যক্তি কেউই জানে না। তার উদ্দেশ্য কি সেটাও পরিষ্কার নয়।

তার হাঁটা চলা ছিল সন্দেহজনক। গোয়েন্দারা এটা জানতে পেরেছে, ঐ অপরিচিত ব্যক্তি ঘটনার দিন বাড়ির সামনে এক ঘণ্টার মত সময় হাঁটা-হাঁটি করেছে। আর এ সময়ের মধ্যে জোড়া খুন সংঘটিত হয়েছে। রহস্যময় ঐ ব্যক্তির নাম লোয়েটে। অ্যাবি এবং এন্ড্রু খুন হওয়ার পরই সে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। ফলে খুনের সন্দেহভাজনের তালিকায় সেও যুক্ত হল। কিন্তু তাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট যৌক্তিক কোন কারণ নেই। বরডেনের বাসায় প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ তিনি সব সময় বাড়ি তালা দিয়ে রাখতেন। ফলে লোয়েটে দরজা ভেঙ্গে বাড়িতে প্রবেশ করেনি। আর এটা এমন নয়, সে প্রথমে অ্যাবিকে হত্যা করে বাইরে চলে গেছে, তারপর বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে, কখন এন্ড্রু আসবে। এন্ড্রু আসার পর তাকে খুন করে চলে গেছে। এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। একথা যুক্তিতে টেকে না। তাহলে এ জোড়া খুনের সাথে কে জড়িত? স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু বাসায় ছিল লিজি তাই প্রাথমিক সন্দেহ তার দিকেই ধাবিত হয়। মানসিকভাবে অশান্তিতে ছিল লিজি। সে-ই হয়তো তার বাবা মাকে খুন করেছে। কিন্তু তার আচরণে সেরকম কিছুই পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। সে বরং স্বাভাবিক ছিল। এমনকি কুড়াল দিয়ে যদি সে তার বাবা মাকে হত্যা করে তাতে রক্তের দাগ লেগে থাকার কথা। তার জামা কাপড়ে রক্তের দাগ থাকবে। সে ধরনের কোন চিহ্ন নেই। অবশ্য লিজি প্রধান আসামী সেটা প্রমাণের জন্য কিছু সাক্ষ্য হাজির করা যায় বটে। এন্ড্রু বরডেন তার কাজের জন্য সকালেই বাইরে গিয়েছিলেন। ডাউনটাউনে গিয়ে সেখানে তার স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দলিলে তার স্ত্রীর সই লাগবে সেজন্যই তার অপেক্ষা। কিন্তু স্ত্রী অ্যাবি যেহেতু আসেনি ফলে তিনিই বাসায় ফিরে গেলেন। বাসায় যখন ফিরলেন তখন তার গৃহপরিচারিকা ব্রিজেট সাথে এল। দু'জনেই এক সাথে ঘরে প্রবেশ করল। ব্রিজেট কোনকিছু না বলে ঘরের কাজে মন দিল। এন্ড্রু চুপ করে বসেছিল। ব্রিজেটের ধারণা অ্যাবি তার শোয়ার ঘরে শুয়ে আছে। ব্রিজেটের এই

BanglaBook.org

ধারণা ছিল ভুল। এদিকে অ্যাবির রক্তমাখা শরীর দোতলায় অতিথি রুমে পড়েছিল। তারপর মৃত্যু হল।

ব্রিজেটের বক্তব্য থেকে জানা যায়,

"লিজি নিচে নেমে এসে পোশাক পরিবর্তন করেছিল। তারপরে টুপি মাথায় দিল। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও উলের জাম্পার পড়ল। বাবার সাথে কথা বলল।"

এন্ড্রু বরডেন এ সময় দোতলায় উঠছিলেন। তিনি থামলেন। লিজির সাথে কথা বলার জন্য মিটিং রুমে সোফায় বসলেন। এ সময় লিজি বাইরে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা বাদ দিল। সে তার বাবার পাশেই বসল। ব্রিজেট দেখল, লিজি তার টুপি খুলে পাশে রেখেছে। আর এন্ড্রু সোফা সেটে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। এরপরের ঘটনা ব্রিজেট আর বলতে পারেনি।

ব্রিজেটের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে ঐ রুমে কিভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তা তমসাচ্ছন্ন থেকেই যায়। প্রখর সূর্যালোকে এবং সকাল বেলায় পুরো ঘর হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে গেয়েছিল। তারপর লিজি নিজেও জানেনা কে কোথা থেকে কুড়াল দিয়ে তার বাবাকে আঘাত করেছে। কিন্তু এটাও কতটা বিশ্বাসযোগ্য? লিজি কি কাউকেই ঘরে প্রবেশ করতে দেখেনি? আর ঘরে যদি কেউ প্রবেশ না করে তাহলে এন্ড্রুকে কে খুন করেছে? ঐ ঘরে তখন লিজি একাই ছিল। সব দোষ প্রাথমিকভাবে তার উপর বর্তায়। আর এটা সবারই জানা ছিল, বাবা ও মেয়ের সম্পর্ক ভাল ছিল না। লিজি তার বাবাকে ঘৃণা করত। সবাই এটাও জানত, এন্ড্রু বরডেন তার কন্যার প্রতি কৃত্রিম ভালবাসা প্রদর্শন করতেন না। তার ৭০ বছরে কখনোই তিনি এরকম কিছু করেননি। বাবা হয়ে কন্যার প্রতি যতটা ভালবাসা, স্নেহ, আদর সবকিছুই উজার করে দিয়েছিলেন, সেটাই স্বাভাবিক। সন্তানের প্রতি সব অনুভূতি বজায় ছিল তার। কখনো লিজির আবদার, দাবী দাওয়া এড়িয়ে যেতে পারতেন না। বরং চেষ্টা করতেন কখন তাকে কি দিতে হবে। লিজি প্রচুর অর্থ অপচয় করত। বিশেষ করে পোষাক, আশাক, জুতো, টুপি ইচ্ছামত কিনত। এন্ড্রু কখনো কিছু বলতেন না। দু'হাতে কন্যা লিজির জন্য বিনা বাক্যে অর্থ ব্যয় করত। তার কাছে টাকা পয়সা কোন ব্যাপার নয়। মেয়ের প্রতি স্নেহ মায়া মমতা তার কাছে প্রধান বিষয়। এর জন্য নতুন করে কোন প্রমাণ দিতে হবে না। আর এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না, লিজি তার বাবাকে ভালবাসত না। বরং বাবার প্রতি সব ভালবাসা শ্রদ্ধা ছিল তার শতভাগ। লিজি অবিবাহিত ছিল। কোন পুরুষের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। ফল রিভারে যত পুরুষ আছে লিজি একমাত্র তার বাবাকেই হৃদয়ের সব কিছু দিয়ে ভালবাসত। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা উজার করে দিয়েছিল। এ শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দেখা যায় যখন লিজি ফল

BanglaBook.org

রিভার কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করল, তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ সবাইকে তাদের প্রিয় বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে আসতে বলে। লিজি তার বাবাকে নিয়ে আসে। কারণ তার বাইরের জগতে কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না। তার মেয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি এন্ড্রু । সে ঠিকই মেয়ের কলেজের অনুষ্ঠানে হাজির হন।

কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেছিল, তোমার প্রিয় বন্ধুকে আংটি পরিয়ে দাও। লিজি তার বাবার হাতে আংটি দিয়েছিল। সেটা এন্ড্রু পকেটে পুরে রাখল। একথা তাই নিশ্চিত করে বলা যায় বাবার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল অপার। মেয়ের প্রতি এন্ড্রুর স্নেহের কমতি ছিল না। তাই এটা অসম্ভব, এন্ড্রুর কোন ক্ষতি চাইতে পারে লিজি। এটা চিন্তাও করা যায় না। সে তার বাবাকে খুব ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। কিন্তু এত কিছুর পরেও কিছু মনস্তাত্ত্বিক ধারণা তার বিপক্ষে যায়। এক্ষেত্রে ব্যাপারটি দাঁড়ায় সিগ্‌মন্ড ফ্রয়েডের দর্শন তত্ত্বের মত।

ডঃ সিগমন্ড ফ্রয়েড মনস্তাত্ত্বিক দর্শন নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। বিশেষ করে পারিবারিক সমস্যা নিয়ে তার বহু রচনা রয়েছে। ফ্রয়েডের তত্ত্বের মতে, একটি নাবালক শিশু তার বাবা মাকে ভালবাসবে, তাদের কাছেই নিরাপত্তাবোধ করবে এটাই প্রকৃতি নিয়ম। আবার অনেক সময় বাবা-মায়ের প্রতি রাগ করবে। তাদের ঘৃণাও করতে পারে। সর্বোপরি সন্তান আর বাবা-মায়ের সম্পর্ক একটা পর্যায়ে এসে সামাজিক বাস্তবতার উপর নির্ভর করে। আর একটি বিষয়ে ছেলে যখন বড় হয় তখন সে তার বাবার প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করে। সে মায়ের প্রতি ভালবাসা উজার করে দেয়। ঠিক একইভাবে কন্যা সন্তান মায়ের প্রতি বিরূপ আচরণ করে আর বাবাকে প্রিয় সাথী ভাবে। তবে সমাজ কখনো এই ধরনের অনুমতি মেনে নেয় না। প্রতিটি বাবা-মা ছেলে মেয়ের প্রতি ভালবাসার কথা আড়াল করে। আসলে প্রকৃত অর্থে তারা কাকে বেশি স্নেহ করে সেটা মন থেকেই তারা বুঝিয়ে দেয়। এটা প্রচার করার বিষয় নয়। এক পর্যায়ে শিশুরাও বিষয়টি বুঝতে পারে। বুঝেও যে তারা কিছু করতে পারে তা নয়। বরং তারাও এ অবস্থা মাটি চাপা দেয়ার মত মনকে চাপা দিয়ে রাখে। এক পর্যায়ে অসচেতন হয়ে পড়ে। আবেগ অনুভূতিকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং বাবা-মায়ের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে সন্তান। অবশ্য ব্যতিক্রম যে কিছু ঘটে না তা নয়। অনেক সময় বাবা-মায়ের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে সন্তান। এর পরিণতি কারো জন্যই ভাল হয় না। লিজির ব্যাপারও সেরকম কিনা তা ভাবা প্রয়োজন। সে তার সৎ মা অ্যাবির প্রতি হিংসা পরায়ণ হয়ে উঠলেও, বাবাকে ভালবাসত। মায়ের প্রতি হিংসা ও ঘৃণার কারণেই কি তাকে খুন করেছে? তাহলে বাবাকে কেন?

BanglaBook.org

লিজির উপর আরো একটি কারণে এ হত্যাকাণ্ডের দোষ চাপানো হচ্ছে আর তাহল এন্ড্রু বরডেন যখন দোতালায় গিয়ে দেখে তার স্ত্রী অ্যাবির লাশ পড়ে মেঝেতে আছে, তারপরই নিচে চলে আসে। নিচে এসেই অ্যাবির মৃত্যুর জন্য মেয়েকে অভিযুক্ত করেন। লিজি চুপ করে বসেছিল। বাবার অভিযোগের কোন জবাব দেয়নি। কিন্তু এটাই বা কি করে সম্ভব, একজন মানুষ তার স্ত্রী খুন হওয়ার পরও শান্ত থাকতে পারে? সে কি চিৎকার করে কেঁদে উঠবে না! এন্ড্রু বরডেন মেয়ে লিজিকে দোষারোপ করে চুপ করে বসে থাকে সোফায়। এ নিশ্চুপতার কোন জবাব নেই। কারো জানা নেই। গৃহপরিচারিকা ব্রিজেট তার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আধঘণ্টা পর লিজির চিৎকার শুনতে পেল সে।

সে চিৎকার করে বলল,

"খুন! বাঁচাও! বাবা খুন হয়েছে।"

এ আধঘণ্টা সময়ে কি ঘটেছিল? ব্রিজেট আদালতে বলেছিল,

"দ্রুত সে ঘরের ভিতর গেল। সেখানে গিয়ে দেখে লিজি ভয়ে কাঁপছে।"

তার বাবাকে কুড়াল দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

এদিকে লিজি জানাল,

"ঐ সময় বাড়ির সামনে ট্যাংকে মাছের চাষ করা হয় সেটা দেখাশুনা করছিল সে। যখন সে ঘরে আসে তখন দেখে তার বাবা খুন হয়েছে।"

দু'জনের দু'ধরনের বক্তব্যে আদালত কোন সমাধানে আসতে পারেনি। দু'জনের বক্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। এর মধ্যে থেকেই বিচারকগণ চেষ্টা করছিল প্রকৃত ঘটনা বের করে আনতে। বাবার উপর আঘাত হানার পর লিজি দেরি না করে ব্রিজেটকে চিকিৎসক আনতে বলেন। এক প্রতিবেশীর কথায় জানা যায়, লিজি কখনোই তার মাকে বিশ্বাস করত না।

ঐ প্রতিবেশীকে লিজি জানিয়েছিল,

"মা বাইরে গেছে।"

বাস্তবে তার মা ততক্ষণে খুন হয়ে গেছে। সে-ই তার মাকে খুন করেছে। ডাক্তার বোয়েন এবং পুলিশ তাদের বাড়িতে আসা মাত্রই লিজি তার গল্প ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে।

সে বলতে থাকে,

"তার মা অ্যাবি বাইরে গিয়েছিল কিছুক্ষণ পর বাসায় ফিরে আসে।"

কিন্তু অ্যাবি বাইরে যায়নি। বাইরে গিয়েছিল বাবা এন্ড্রু।

ডঃ বোয়েন এবং পুলিশ কর্মকর্তারা মৃতদেহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এন্ড্রু বরডেনকে ধারাল কোন অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে। সম্ভবত সেটা কুড়াল হতে পারে। কুড়াল দিয়ে তাকে একের পর এক আঘাত

BanglaBook.org

করা হয়েছে। আঘাত প্রতিরোধ করার মত সামর্থ্য তার ছিল না। দ্রুতই তার মৃত্যু ঘটে। এন্ড্রুর মৃতদেহ নিয়ে পুলিশ এত তদন্ত করেছে ঠিক সেসময় অ্যাবির অনুপস্থিতিতে অবাক হয়ে যায় পুলিশ। তারা জানতেও পারেনি অ্যাবি ইতিমধ্যেই খুন হয়ে গেছেন। বরং তাদের বলা হল অ্যাবি বাইরে গেছে। ব্রিজেট নিজেও জানত না অ্যাবি খুন হয়েছেন। ব্রিজেট অতিথি কক্ষের ময়লা পরিষ্কারের জন্য ঝাড়ু আনতে দোতলায় গিয়ে দেখে অ্যাবির লাশ পড়ে আছে। নতুন করে ভীতি যোগ হল। পুরো ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল বাড়িতে।

জোড়া খুনের ঘটনা পুরো ম্যাসাচুটস শহরে ছড়িয়ে পড়ে। আলোচনার বিষয় হয়ে উঠে এ জোড়া খুনের ঘটনা। বহু মানুষ এ বাড়িটি দেখতে আসে। অবশ্য পুলিশ কাউকে বাসায় প্রবেশ করতে দেয়নি।

এ জোড়া খুনের সাথে জন মর্সের জড়িত থাকার ব্যাপারটি একেবারে হেলায় ফেলে দেয়া যায় না। সাধারণত এন্ড্রুর বাসায় কেউ প্রবেশ করতে না পারলেও ঘটনার আগের দিন জন মর্স এসেছিলেন। রাতের খাবার খেয়েছিলেন, ঐ রাতে বরডেনের বাসায় ছিলেন। এন্ড্রু বরডেনের সব গোপন খবর জানতেন জন মর্স। ফলে এ খুনের সাথে তার জড়িত থাকা তার পক্ষে বিচিত্র নয়। যদি কোন ব্যবসায়িক মুনাফা থাকে, তাহলে জন মর্স খুন করবে এন্ড্রু এবং অ্যাবিকে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?

জন মর্সের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশেষ করে উত্তেজিত জনতার প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। পুলিশ তা বুঝতে পেরে তার প্রতি সব ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল। একই সাথে পুলিশ তাকে এন্ড্রু এবং অ্যাবি হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জেরা করতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ কিছুটা নিশ্চিত হয়, এন্ড্রুর খুনের সাথে জন মর্স কিছুটা হলেও জড়িত। যদিও অ্যাবিকে সে খুন করেনি এমনকি তার ভাড়া করা কোন লোক এ কাজ করেনি। পুলিশের বিশ্বাস এ জোড়া খুনের নায়ক একজন। সে-ই অজ্ঞাত খুনী দু'জনকে খুন করে চলে গেছে। প্রথমদিকে পুলিশের ধারণা ছিল খুনী খুবই পরিচিত কেউ একজন হবে। কিন্তু চিকিৎসকরা ময়না তদন্ত করে জানতে পারল, এন্ড্রুর দু'ঘণ্টা আগে অ্যাবি খুন হয়েছে তখন সিদ্ধান্ত পাল্টাল গোয়েন্দা বিভাগ। তারা বুঝতে পারছিল না এ দু'ঘণ্টা খুনী কোথায় লুকিয়ে ছিল। নতুন করে তদন্ত করতে থাকে তারা। পুলিশ পুরো বাড়ি তল্লাশী করে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রের সন্ধান করে, ব্রিজেট তার ঘর থেকে বেশ কিছু কুড়াল দেখায় পুলিশকে। তদন্তের প্রধান কর্মকর্তা মার্শাল জন ফ্লিট একটা কুড়াল হাতে তুলে নেন। সেটা ব্রিজেটের কক্ষেই ছিল। কুড়ালটির সামনের অংশ হাতল ভাঙ্গা। কুড়ালটির গায়ে কোথাও রক্তের দাগ এবং ছাপ নেই। জন ফ্লিটের ধারণা হাতল ভাঙ্গা কুড়ালটি দিয়ে খুন করে তারপর পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা

BanglaBook.org

হয়েছে। যেন কোথাও কোন চিহ্ন না থাকে। কুড়াল পরিষ্কার করার সময় কাঠের হাতল ছিল না। সম্ভবত ভাঙ্গা কুড়াল দিয়েই খুন করা হয়েছে। তাহলে কুড়ালের হাতল কোথায় গেল? সেটা আর কখনোই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনও হতে পারে কুড়ালের ভাঙ্গা হাতল লিজি পুড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে লিজিকে জোড়া খুনের জন্য সন্দেহ করেনি।

পুলিশ এন্ড্রু বরডেনের শস্যাগারে গেল। সেখানে প্রচণ্ড গরম অনুভব করল। এক মুহূর্ত সেখানে থাকতে না পেরে পুলিশ প্রধান জন ফ্লিটকে জানাল,

"শস্যাগারে এতটাই গরম যে সেখানে এক মুহূর্ত থাকা যায় না।"

লিজি কেমন করে সেখানে আধঘণ্টা কাটাল। আরো আশ্চর্যের বিষয় শস্যাগারে সুন্দরমত পরিষ্কার করা হয়েছে। কোথাও কোন খুঁত নেই। সবকিছু ছিমছাম।

হত্যাকাণ্ডের পরের দিন ডাক্তার বোয়েন যখন জন ফ্লিটকে বললেন,

"অ্যাবিকে বিষপানে হত্যার জন্য লিজি প্রেসক্রিপশন ছাড়াই এলিবেঙ্গ ফার্মাসি থেকে এসিড কিনতে গিয়েছিল তখনই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে লিজির সাথে যোগসূত্র থাকতে পারে ভেবে তাকে সন্দেহ করলেন জন ফ্লিট।"

তার ধারণা অ্যাবিকে হত্যা করার কারণ হতে পারে, যেহেতু এন্ড্রুর সম্পত্তির অর্ধেকটা পেতে যাচ্ছে অ্যাবি, তাই তাকে শেষ করে দিতে হবে। এ কাজ লিজিই করেছে। এমা কখনোই সন্দেহের তালিকায় পড়েনি। কারণ হত্যাকাণ্ডের সময় এমা বাড়ীতে ছিল না।

ফল রিভারের সম্পদশালী এবং বিত্তবান নাগরিক হত্যার কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পুলিশকে অত্যন্ত সাহসিকতা, ধৈর্য্য এবং মেধার পরিচয় দিতে হয়েছে। পুলিশ প্রথমে ব্রিজেটকে গ্রেফতার করে জেরা করে। ব্রিজেট আইরিশ অভিবাসী। যুক্তরাষ্ট্রে তার কেউ নেই। এন্ড্রুর বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করে। সে অত্যন্ত সাধারণ মহিলা। তার পক্ষে এত বড় অপরাধ করা সম্ভব নয়। তাহলে এটা পরিষ্কার লিজিই অপরাধী। লিজি নিজেই তার বিপদ ডেকে এনেছে। ব্রিজেটের পক্ষে অ্যাবিকে খুন করা সম্ভব নয়। এমনকি এন্ড্রুকে সে খুন করেনি। লিজির পক্ষেই খুন করা সম্ভব। এটাই ধারণা করছে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ। তার দিকেই সন্দেহের সব বীজ বপন করছে পুলিশ। যেহেতু কুড়াল দিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং প্রচুর রক্ত ঝরেছে তাতে একটি বিষয় দাঁড়ায় যে খুনীর পোশাকে প্রচুর রক্ত লেগেছে। পুলিশ পুরো বাড়ি তল্লাশী করে রক্ত মাখা সেই পোশাক খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও সেই পোশাকের অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি। বহু অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হল। এটা নিশ্চিত হয়ে গেল যে লিজি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এসমস্ত কাজ করেছে। পুলিশ যখন তাকে জেরা করেছে সে যতটা পেরেছে

BanglaBook.org

অত্যন্ত নম্রভাবে উত্তর দিয়েছে। এমনকি সে তার সব পোশাক দেখিয়েছে। আলমারিতে যে সব পোশাক ছিল তাও পুলিশকে দেখিয়েছে। যাই হোক হাতল ভাঙ্গা কুড়ালটি পুলিশ হার্ভার্ড মেডিকেল বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠায় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য। এ পর্যন্তই সবকিছু স্থিমিত হয়ে গেল।

এদিকে পারিবারিক আইনজীবীর উপদেশে এন্ড্রু বরডেনের বোন জে-জেনিংস পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন খুনীকে ধরিয়ে দিতে পারলে ৫ হাজার ডলার পুরস্কার দেবেন তিনি। কিন্তু কেউই কোন তথ্য দিতে পারল না। ম্যাসাচুটসের স্থানীয় পত্র-পত্রিকা লিজির নাম গোপন রেখে শুধু প্রতিবেদন লিখল এন্ড্রুর ছোট মেয়েই সন্দেহভাজন আসামী। ঐ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, পুলিশের মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে আসামী একজন মহিলা। সাধারণ মানুষ যখন পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারল এন্ড্রু বরডেনোর তার সম্পত্তি কোন প্রকার দলিল করতে পারেননি এবং তার আগেই মারা গেছেন তাহলে এই বিশাল সম্পত্তির মালিক লিজি এবং এমা। তাহলে এদের দু'জনের যে কেউ অবশ্যই খুনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

ম্যাসাচুটসের হাজার হাজার মানুষ এন্ড্রু এবং অ্যাবির শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিল। বহু মানুষ দুঃখ পেল, তারা কাঁদল। অনেকেই এ হত্যাকাণ্ড স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। সাধারণ মানুষ দুঃখ পেলেও লিজির মধ্যে কোন দুঃখ কষ্ট ছিল না। এটা দেখে অনেকে চিন্তা করেছে। অবশ্য বিষণ্নভাব ঠিকই বজায় ছিল লিজির মধ্যে। বাবা-মায়ের মৃত্যুতে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়েছিল বটে, সেটা ক্ষণিকের জন্য। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজকর্ম সবই পুলিশ করল। কফিন থেকে লাশ নামিয়ে কবরে শায়িত করে দিল তারা। সুন্দরমত শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। যেহেতু ম্যাসাচুটসের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ছিলেন এন্ড্রু বরডেন তাই তার নামে শোক বই খোলা হল। বহু মানুষ শোক প্রকাশ করল। কবরে শায়িত হওয়ার পর সব কিছুই যেন শেষ হয়ে গেল। সত্যিই কি আলোচনা থেমে গেল। মানুষের মনে সন্দেহ কখনো দূর হয়নি। হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পরেও বরডেনের বাড়িতে বহু মানুষ এসেছে। তার কবরে গিয়ে প্রার্থনা করেছে। আগতদের অধিকাংশই লিজির বন্ধু-বান্ধবী। তার সহকর্মী এবং সহযোগীও বটে। তারা এন্ড্রু ও অ্যাবির কবরে দাঁড়িয়ে তাদের শোক প্রকাশ করেছে। লিজির বন্ধু-বান্ধবরা বাড়ি থেকে তার জন্য জেলি, কেক এবং আরো অনেক খাবার নিয়ে এসেছে। সব সময় লিজিকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করেছে। কখনো যেন সে দুঃখে ভেঙ্গে না পড়ে, কষ্ট না পায় সেজন্য বন্ধু-বান্ধব কাজে কর্মে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তবে লিজি সবসময় সাংবাদিকদের থেকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে গেছে।

BanglaBook.org

সংবাদপত্র জগতের লোকেরাও লিজির পেছনে নাছোড়বান্দার মত লেগেছিল। হত্যাকাণ্ডের ঘটনা যখন পারিবারিকভাবে তদন্তের ঘোষণা এল তখন পত্র পত্রিকায় লেখা হল, লিজির প্রভাবে এ কাজ হয়েছে। লিজি নিশ্চয়ই তদন্ত কারীর পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতেই তার এ পদক্ষেপ।

লিজি নিজেই যখন বাবা-মা হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী হিসাবে তদন্তকারীর কাছে সব তথ্য জানাবেন তখন এ প্রশ্ন এসে যায় তিনি কি সত্য কথা বলবেন? নাকি সব কিছু আড়াল করে ফেলবেন। পরিস্থীতি কঠিন পর্যায়ে চলে যেতে থাকে। বাস্তবতা হচ্ছে, এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নতুন করে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। লিজিই সন্দেহ আর বিতর্কের সূচনা করল। তদন্ত কর্মকর্তার কাছে তার জবাব জটিলতা সৃষ্টি করল। একথা সত্য, লিজি জানত অ্যাবি বাইরে গেছে। কিন্তু তারপরেই সে জেনেছিল, অ্যাবি বাইরে নয় বাসায় রয়েছে। লিজি মনে মনে ভেবেছিল অ্যাবি হয়তো বাইরে। এমন হতে পারে সে শস্য খামারে। না তা নয়। বরং তাকে দেখতে পেল পুকুর পাড়ে। অ্যাবি কমপক্ষে বিশ মিনিট বাইরে ছিল। আসলে এটাও সঠিক নয়। সে কতক্ষণ বাইরে ছিল তা ঠিকমত জানা যায়নি।

প্রশ্নাতীতভাবেই একথা বলা যায়, লিজির আচরণ ছিল সন্দেহজনক এবং সে কোনভাবেই নির্দোষী নয়। নিজের বক্তব্যে অবিচল থাকতে এক এক সময় এক এক কথা বলত। মূলত সে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছিল। আবার এটাও সত্য, তার বিরুদ্ধে বাস্তব কোন প্রমাণ নেই। খুনের কোন সাক্ষী প্রমাণ নেই। মানুষ একটা ধারণাই জোড়া খুন করতে পারে এমন মানুষের দ্বারা হয়েছে যে এখনও অপরিচিত। পুলিশকে খুনের ঘটনা পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেয়া হল। গোয়েন্দা বিভাগের এ সিদ্ধান্ত লিজিকে মোটেই জানান হল না। তবে পুলিশ শুধু লিজিকে নয় তদন্তে এবার আরো অনেককেই সন্দেহের তালিকায় আনতে চেষ্টা করে। তবে সবকিছু যেন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে অন্য কোথা থেকে। এটাই ছিল আশ্চর্যের বিষয়। পুলিশ তদন্ত কর হৈশদূর এগুতে পারেনি।

বাবা-মায়ের খুনের জন্য লিজিকে সন্দেহ করা এবং তাকে রিমান্ডে নেয়ার জন্য পুলিশের আবেদন আদালত বাতিল করে দিল। বরং আইনানুযায়ী মামলা পরিচালনার কথা বলল আদালত। খুনের ঘটনা নিয়ে পুলিশ এবং বিচার বিভাগের টানাপোড়েনে ভালই নাটক চলছে থাকে। পত্র-পত্রিকায় সেসব কাহিনী ভাল মতই প্রচার হচ্ছিল। একটার পর একটা নাটক সাজাচ্ছে বিচার বিভাগ। পুলিশও কম যায় না। একেক সময় একেকজনকে সন্দেহের তালিকায় যুক্ত করছে। এমনি একজন মহিলাকে সন্দেহ করল পুলিশ। সেই মহিলা গীর্জার সেবিকা হিসাবে কাজ করত। সামান্য একজন সেবিকা খুন করতে পারে এন্ড্রু বরডেন এবং অ্যাবিকে সেটা ভাবাই যায় না। পুলিশ কেন এ ধরনের সন্দেহ

BanglaBook.org

করে পরিস্থিতি জটিলের দিকে নিচ্ছে তা কারো বোধগম্য নয়। পুলিশের এই আচরণ সংবাদপত্র জগতে দারুণভাবে সমালোচিত হল। যা হোক একপর্যায়ে সাংবাদিকরাও এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে লেখার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলল। তারা বিষয়টি ইস্তফা দিল।

পুলিশের ব্যাপক সন্দেহের কারণেই লিজিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে বিনা বিচারে নয় মাস জেল খাটতে হয়েছে। আদালত তাকে নির্দোষ ঘোষণা দিলে সে মুক্তি পায়। জেলের প্রধান ম্যাট্রন মিস রিগ্যান নিয়মিত দেখতে আসতেন লিজিকে। তার সাথে বহু বিষয়ে কথা হত লিজির। ম্যাট্রন মিস রিগ্যান একবার লিজি ও এমার সাথে পুরো ঘটনা নিয়ে তর্ক করেন। তিনি তাদের বিশেষ কিছু কথা লিপিবদ্ধ করেন। তাদের বিবৃতি আদালতে উপস্থাপন করেন।

এলি বেন্সের ঔষধের দোকান থেকে লিজি এসিড কিনতে চেয়েছিল সেটাও জানান হল। বিষ কেনার জন্য লিজির ব্যর্থ চেষ্টার কথা জানা যায় আদালতের মাধ্যমেই। বাস্তবেই লিজির আচরণ ছিল, খুবই ভয়ার্ত এবং বিচিত্র। বহুমাত্রিক আচরণ করত সে। শত্রুর উপর নিষ্ঠুর আচরণ করতে বিন্দুমাত্র ছাড়ে না। মিস রিগ্যানের মাধ্যমে জানা যায়,

"লিজি তার বোন এমাকে বলেছিল, তুমি আমাকে দেশের বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।"

যাই হোক পিউরিফাই এসিড কিনতে ব্যর্থ হয়ে লিজি বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিল ঐ ড্রাগস্টোরের প্রতি। কিন্তু এর কোন প্রমাণ পায়নি পুলিশ। আর লিজি কোনভাবেই তার বাবা-মায়ের খাদ্যে বিষ মেশায়নি। যদি ধরেও নেয়া হয় লিজি বিষ মিশিয়েছিল, তাহলে যে প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায় ঐ খুনের আগের দিন বাড়িতে যারা ছিল সবাই ঐ খাবার খেয়েছিল। লিজিও খেয়েছিল। পরের দিন সুস্থ হল কিভাবে তারা? তাহলে এটা কি লিজির কোন ধূর্তামি? এটাও তার পরিকল্পনার অংশ। নিজের অসুস্থতা একটা নাটক কি? বিশেষ করে অ্যাবি অসুস্থ হয়েছিল বেশি।

হত্যার আগের রাতে খাবারে বিষ মেশানো এবং সবাইকে অসুস্থ করে দেয়ার সাথে পরেরদিনের খুনের ঘটনা সবকিছুই লিজি জড়িত, এটাই বাস্তবতা। কিন্তু এ কঠিন সত্য, প্রতিষ্ঠিত করতে যত কিছু প্রমাণের প্রয়োজন সেটা কারো কাছেই নেই। সবকিছুই রহস্যময়। অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সব কিছু। সুন্দর স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ পুনরায় এলি বেন্সের হিসাবপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করল। লিজি তার কাছ থেকে এসিড এবং বিষ কেনার জন্য কখনো কোন টাকা দিয়েছে কিনা সেটাও তদন্ত করা হল। ঔষুধ বিক্রির নথিপত্র খুঁজে বের করা হল। তেমন কোন প্রমাণ মেলেনি। এভাবে হার্ভার্ড মেডিকেল ল্যাবরেটরি বিভাগ যখন কুড়াল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোন প্রমাণ পায়নি।

BanglaBook.org

এ কুড়াল দিয়ে এন্ড্রু এবং অ্যাবিকে খুন করা হয়েছে, এবং লিজির জুতো, মোজা, উলের পোষাকসহ অন্যসব পোষাকও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হল তাতে কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই। এটাই প্রমানিত হয় যে সে নির্দোষ!

লিজির আইনজীবী জেনিংস আদালতের কাছে সুস্থ বিচার দাবী করলে আদালত এই রায় দেন।

জেনিংস তার বক্তব্যে বলেন,

"এ অপরাধ সত্যিই রহস্যময়! কিন্তু তার মক্কেল এ ধরনের ঘৃন্য কাজ করেনি।"

আরো একটি ব্যাপারে জেনিংস খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল, খুনি যখন তার কুড়াল দিয়ে হত্যা করল সে সময় রক্ত ছিটকে এসে তার পোষাক ভিজে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই রক্তমাখা পোষাক কোথায় হারিয়ে গেল? যেহেতু পোষাক পাওয়া যায়নি এবং সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রমাণ, আর তা না পাওয়া পর্যন্ত নিজেকে অপরাধি বা খুনি বলা যায় না। এই ঘৃন্য অপরাধের শাস্তি লিজি পেতে পারে না। আদালতে জেনিংস তার বক্তব্য তুলে ধরেছিল, মক্কেলকে বাঁচানোই আইনজীবীর কাজ। সেটাই করেছিল জেনিংস। কিন্তু আদালত বহু চিন্তা ভাবনা করে দেখল লিজিকে আরো জেরার দরকার আছে। তাকে বিচারকের সামনে হাজির হতে হবে সেজন্য তাকে মুক্তি না দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

মানুষ বিভিন্ন প্রকার মতামত দিতে শুরু করে। তাদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিল। বিশেষ করে বিচার বিভাগে আচরণে ক্ষুব্ধ হল তারা। একটি খুনের ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীকে পুলিশ খুঁজে বের করতে পারে না তাহলে এ পুলিশ বিভাগের কোন প্রয়োজন আছে কি? এমন প্রশ্ন করতে থাকে অনেকেই। পত্রপত্রিকায় লেখা হয়, মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে পুলিশ যেহেতু প্রকৃত খুনিকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ তাই তারা লিজিকে বলির পাঁঠা বানাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ লিজিকে নির্দোষ মনে করে। তারা স্বেচ্ছায় লিজির পক্ষে দিতে এগিয়ে আসে। লিজির আইনজীবির প্রতি সবার বিশ্বাস এবং আস্থা রয়েছে, গির্জার প্রধান এবং সেবিকা প্রার্থনা করেছে লিজির জন্য। খ্রিষ্টিয় মহিলা সমিতি লিজিকে পূর্ণ সমর্থন করেছে। নারী অধিকার এবং মানবাধিকার সংস্থা লিজির পক্ষে মিছিল করেছে এবং তার মুক্তি দাবি করেছে। লিজির বিষয়টি দিনকে দিন বিতর্কিত হয়ে চলেছে।

আদালতে বিচারকগণ এ মামলার সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিল এবং কিভাবে লিজির কাছ থেকে সত্য উদ্‌ঘাটন করা যায় সেই সিদ্ধান্ত নিল তখনই নতুন ঘটনা ঘটল। আর তখনই প্রথমবারের মতো এমার বন্ধু অ্যালিস র‍্যামেনকে সন্দেহের তালিকায় নিয়ে আসা হল। সরকার পক্ষের কৌশলী তাকে জেরা করল। মিস র‍্যামেন ঐ হত্যাকাণ্ডের তিনদিন পর এমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। এমা এবং মিস র‍্যামেন রান্না ঘরে বসে গল্প করছিল। ঠিক তখনই লিজি হাজির হল।

BanglaBook.org

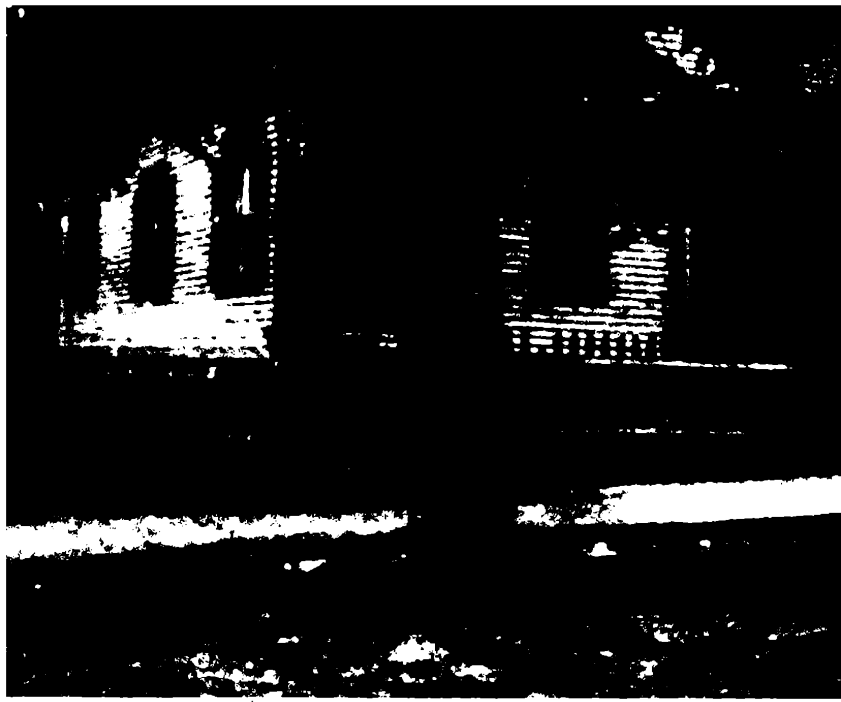

অ্যান্ড্রু বরডেনের বাড়ি। এখানেই হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়েছে

তার হাতে বাদামী রংয়ের একটি পোষাক ছিল। পোষাকটি মেলে ধরে কাঁদলো লিজি তারপর আগুনে পুড়িয়ে ফেলল। প্রত্যক্ষদর্শী মিস র‍্যামেন বলেন,

'লিজির কাছে মনে হয়েছিল এ পোষাক প্রয়োজনহীন, তাই পুড়িয়ে ফেলেছে।'

অ্যালিস র‍্যামেনের কথা বিচার বিভাগ লিপিবদ্ধ করল। যে পোষাক লিজি পুড়িয়ে ছিল ঘটনার তিনদিন পর কিন্তু পুলিশ হত্যাকান্ড ঘটার পরেরদিন পুরো বাড়ি তল্লাশি করে ঐ পোষাক পায়নি। পুলিশ দু'বার পুরো বাড়ি তল্লাশি করেছিল। তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। রক্তমাখা পোষাক উদ্ধার করতে পারেনি। বিচারকদের কাছে মনে হয়েছে লিজি এমনভাবে পুলিশকে আয়ত্তে এনেছে যে তারা অনেক কিছু লুকিয়ে গেছে। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পুলিশই বা কেন সত্য গোপণ করার চেষ্টা করল? তারা কি কোন অবৈধ টাকা পয়সা লেনদেন করেছে লিজির সাথে? আর অ্যালিস র‍্যামেনের কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য যে পোষাক পুলিশ পরের দিন তল্লাশি করে পায়নি সেই পোষাক লিজি তার বোন এবং বান্ধবির সামনে পুড়াচ্ছে। এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সত্যিই দুরুহ ব্যাপার। তাদেরকে যখন ঐ পোষাকের ব্যাপারে প্রশ্ন কর হল তখন তারা কিছুই জানেনা বলে এড়িয়ে গেল। তবে এটাও ঠিক সাক্ষ্যপ্রমাণে যা পাওয়া যায় তাতে লিজি বরডেন এ খুনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত এবং তার বিচার হওয়া উচিত।

লিজি বরডেন গ্রেফতার হওয়ার পর বিচার চলল নয় মাস। বিচারের অবস্থা দাঁড়াল লিজি বনাম সাধারণ জনতা, এক পর্যায়ে সবাই বিরক্ত বোধ করল। বিষণ্নতায় ভরে উঠল লিজির মন। সে অনেকটা ভেঙে পড়ল। তারপরেও চেষ্টা করেছিল নিজেকে স্থির রাখতে। দীর্ঘসময় জেলে থাকতে থাকতে লিজি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। সে পরিত্রাণ পেতে চাচ্ছিল। অবশেষে তাকে চূড়ান্ত বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। তিনজন বিচারক তাকে নানা প্রশ্ন করল। বেডফোর্ড কোর্ট হাউসে বিচার কার্য চলছিল। তাকে প্রশ্ন করা হল, *'সে কি নিজেকে অপরাধী ভাবে কি না?'*

লিজি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জবাব দিল,

'আমি নির্দোষ। কোন অপরাধ করিনি।'

জুরি বোর্ডের নির্বাহী পর্ষদের প্রধান বিচারক জর্জ রবিনসন যিনি বোষ্টন থেকে এসেছেন এবং খ্যাতনামা আইনজ্ঞ তিনি মনোযোগ সহকারে লিজির কথা শুনছিলেন। যে সব আইনজীবিরা লিজিকে জেরা করছিল তাদের নেতৃত্বে ছিলেন হোসে নেলটন। আবার বিরোধী পক্ষের অর্থাৎ লিজির পক্ষের আইনজীবিরাও ছিলেন। দুই পক্ষের মধ্যে প্রবল তর্ক বিতর্ক চলছিল। সরকার পক্ষের কৌশলীরা খুবই আস্থাশীল ছিল তাই তারা লিজির বিপক্ষে যারা সাক্ষ্যপ্রমাণ অতীতে আদালতে দিয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে তাকে অপরাধী এবং খুনী প্রমাণের চেষ্টা করছিল।

লিজিকে অপরাধী বানানোর যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে। কিন্তু এক পর্যায়ে তাদের মধ্যেও শংকা সৃষ্টি হল। যখনই তারা প্রমাণের চেষ্টা করল ঠিক

BanglaBook.org

তখনই সরকার পক্ষের কৌশলীরা তিন রকমের বক্তব্য উপস্থাপন করল। শুরু হল নিজেদের মধ্যে বিরোধ।

বিচার বিভাগের নিরাপত্তা পর্ষদের প্রধান আইনজীবি জর্জ রবিনসন চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি বিচারকদের দিকে তাকালেন, নিজেও অসহায় হয়ে পড়লেন। কোন গতি খুঁজে পাচ্ছেন না। শুধু এটুকু বললেন,

'লিজি যেহেতু দোষ স্বীকার করছে না এবং তার বক্তব্য এখন পর্যন্ত প্রমাণ সাপেক্ষ নয় তাই তাকে মুক্তি দেয়া ঠিক হবে না।'

লিজির মুক্তি প্রদানে বিরোধীতা করেছিলেন জর্জ রবিনসন। তার এ বিরোধীতা আদালত মেনে নেয়। লিজিকে তাৎক্ষণিভাবে মুক্তি দেয়নি আদালত।

সরকার পক্ষের কৌশলী ও আইনজীবি হার্ভার্ড মেডিকেল কলেজের তিন সিকিৎসককে প্রশ্ন করেছিল,

'কুড়াল এবং লিজির জামা-কাপড় পরীক্ষা করে তারা কি জানতে পেরেছে।'

তারা কি নিশ্চিত হতে পেরেছে এ কুড়াল দিয়েই লিজি তার বাবা-মাকে হত্যা করেছে? চিকিৎসকদের উত্তর শুনে আইনজীবিরা আরো দ্বিধাগ্রস্থ হল। হাতল ভাঙা কুড়াল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা জানিয়েছে কোন মহিলার দ্বারা এ কুড়াল দিয়ে খুন করা সম্ভব নয়। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ বলছে,

'খুন এ কুড়াল দিয়ে করা হয়েছে। এটাই ছিল প্রধান অস্ত্র।'

আবারো বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রমাণের জন্য কুড়াল পাঠানো হল। বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা জানাল, এন্ড্রু ও অ্যাবিকে যত টুকরা করা হয়েছিল তার সবটাই কুড়াল দিয়ে করা হয়নি।

এদিকে লিজির পক্ষের আইনজীবিরা একথা শুনে উৎফুল্লিতবোধ করল। তারা আশার আলো দেখতে পেল। তারা চিকিৎসকদের কাছে জানতে চাইল, তা হলে তার রক্তমাখা জামা যেটি পোড়ানো হয়েছে সেটকি সাজানো নয়? হার্ভার্ড মেডিকেলেল চিকিৎসকরা বললেন,

'ঐ রক্তমাখা জামা কোন মানুষের রক্ত নয়।'

এবার আদালত নিরাপত্তা পর্ষদের দ্বিতীয় দাবী সেটাও বিচার করে দেখল। লিজি যে ড্রাগষ্টোর থেকে বিষ কিনতে চেয়েছিল তার সাথে এ খুনের যোগসূত্র নেই। এভাবে চলল বিচার কার্য। কিছুদিনের জন্য বিরতি দেয়া হল। দশদিন পর ঐ মামলা আবারও কাঠগড়ায় উঠল। এবার সরকার পক্ষের কৌশলী এবং বিচারকরা সরে দাঁড়াল। তারা আর এ বিচার কার্য করে সময় নষ্টের পক্ষে নয়।

নিরাপত্তা পর্ষদের পক্ষ থেকে বলা হল, পুলিশ প্রকৃত খুনিকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরাধীর খোঁজ পায়নি তারা। বরং লিজিকে অপরাধী বানাতে গাল-গপ্প সাজিয়েছে। বরং জর্জ রবিনসন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন যারা এন্ড্রু বরর্ডেনের শস্য খামারে গিয়ে যথেষ্ট তল্লাসি করেছে।

BanglaBook.org

তারা সেখানে গিয়ে দু'জন শস্যখামারীর কর্মচারীদেরকে দেখতে পায়। তরুণ দু' শস্য খামারী হচ্ছে টম বারলো এবং এভার্ট ব্রাউন।

জুরি বোর্ড যদি পুলিশের কথা বিশ্বাস করে তাহলে লিজি মিথ্যা বলছে। লিজি বলেছে যখন তার বাবা খুন হয় সে সেসময় শস্য খামারে ছিল। কিন্তু জুরি বোর্ড শস্য খামারের ঐ দু' তরুণ কর্মচারীর কথা শুনল তারা নতুন করে সংশয়ে পড়ল। ফল রিভারের এ কাহিনী যেন টম সয়ার এবং হ্যাকেল বেরি ফিনকেও হার মানায়। টম সয়ার এবং হ্যাকেল বেরি ফিন তারা ঘটনার পর সবাই যখন সব কিছু জেনেছে তারপরই তারা ঘটনা স্থলে যেত। তারা হত্যাকারীকে খুঁজত।

শস্য খামারের ঐ দু' তরুণ তারাও এন্ড্রু বরডেনের বাড়ির ভেতর চিৎকার শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু তারা ভেতরে যেতে পারেনি। ভেতরে প্রবেশের অধিকার ছিল না তাদের। যা হোক শস্য খামারে গিয়ে পুলিশ যথা সম্ভব তদন্ত করে সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে ছিল। সরকারি কৌশলীরা সেই দু' তরুণকে যথা সম্ভব জেরা করেছিল। কৌশলীদের প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে তারা বিরক্ত বোধ করছিল। তারা কি কোন চিৎকার শুনেছিল কি না এ প্রশ্ন বার বার করছিল কৌশলীরা। আইনজীবিদের বিশ্বাস শস্য খামারের ঐ তরুণরা কোন চিৎকার শুনেনি।

নিরাপত্তা পর্ষদের কাছে শস্য খামারের কর্মরত দু' তরুণ জানায়,

'তারা লিজিকে বাইরে যেতে দেখেছে। সম্ভবত সে শস্য খামারের দিকেই আসছিল।'

কৌশলীরা এতে কৌতুহলবোধ করেন। তারা বলল, *'সম্ভবত'* শব্দ দিয়েই বুঝা যায় এটা নিশ্চিত নয়। এর অর্থ দাঁড়ায় লিজি শস্য খামারে যায়নি। তারা তরুণদের কথা শুনে হাস্য রসে মেতে উঠল। বিষয়টি হাল্‌কা করে ফেলল তারা। তারপর তাদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করে ত্যাক্ত-বিরক্ত করে ফেলল। মূল বিচার কাজ এবং খুনের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অযাচিত সব প্রশ্ন করল। যা ছিল একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

বিচারকার্য পরিচালনা করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল। কারণ লিজি যেই পোষাক পুড়িয়ে ফেলেছে তাকে কি সত্যিই রক্তের দাগ লেগেছিল? এর প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ পোষাক পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিল লিজি।

পুলিশের নিরাপত্তা পর্ষদের নির্বাহী প্রধান জর্জ রবিনসন একটা বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, লিজি যে পোষাক পুড়িয়েছে সেটাই আসল পোষাক, যাতে রক্ত লেগেছিল। সে কোন প্রমাণ রাখতে চায়নি। লিজির আইনজীবিরা রবিনসনের এ অভিযোগ অস্বীকার করল। তারা আদালতকে এ অভিযোগ বাদ দিতে বলল। তারা বলল, এটা সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক কথা। পোষাক পোড়ানোর সাথে খুনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু রবিনসনের যুক্তি হচ্ছে, তাহলে তার বড় বোন এমার সমানে কেন পোষাক পোড়াল। স্বাক্ষী তার বোন।

BanglaBook.org

আদালতে এমার বক্তব্য বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হল না। সেটা নিছক বক্তব্য ধরে নেয়া হল। কোন আইনজীবি প্রত্যাশা করেনি লিজির বিরুদ্ধে এমার বক্তব্য ও যুক্তি সঠিকভাবে মূল্যায়ণ করা হোক। এতকিছুর পরেও আদালতে এমা বলে,

'সে লিজিকে পরামর্শ দিয়েছিলে ধূসঢ় রঙের পোষাক পুড়িয়ে ফেলা উচিত। সে বার বার তাকে মানসিকভাবে আঘাত করে ছিল।'

রবিনসন তার দীর্ঘ বিবৃতির উপসংহার টেনে বললেন,

'ঘটনার সার্বিক পর্যালোচনা করে এটাই প্রমাণিত হয় লিজি অপরাধী এবং খুনি। তাকে শাস্তি দেয়া হোক।'

জুরি বোর্ডের সদস্যদের উদ্দেশ্যে রবিনসন জোরালো আহ্বান করলেন যে পুরো ঘটনা নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করে লিজিকে দোষী প্রমাণ করা হোক। সরকারি পক্ষের কৌশলীরা নীতিগতভাবে রবিনসনের সাথে একমত হলেন যে রিয়েল এষ্টটের সম্পত্তির বিরোধ নিয়ে বাবা এন্ড্রুর সাথে সংঘাত হয়েছিল।

তার ধারণা হয়েছিল বাবা সব সম্পত্তি মায়ের নামে লিখে দেবে। সেভাবেই দলিল করবে। লিজিকে সবাই জানত স্বাভাবিক এবং সাধারণ মেয়ে হিসেবে। সম্পদের প্রতি তার কোন মোহ নেই। গীর্জার সেবিকা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে সে মেতে থাকত। সে কেন হঠাৎ করে তার বাবার রিয়াল স্টেটের সম্পত্তির প্রতি লোভী হয়ে উঠল সেটাই প্রশ্ন। আর তার সৎ মাকে বাবা কতটুকুন বা দিচ্ছে। সব শেষে জানা গেল মাত্র সম্পত্তির এক আনাও দেয়নি তাকে। যেটুকু দিয়েছে তার মূল্য মাত্র ১ হাজার ৫০০ ডলার।

যে কুড়াল দিয়ে অ্যাবি ও এন্ড্রুকে খুন করা হয়েছে মেডিকেল বিশেষজ্ঞ এবং পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে এই ধরনের হাতল ভাঙ্গা কুড়াল একই কারখানা থেকে প্রচুর তৈরী করা হচ্ছে। কৌশলীরা সেটাই জানাল। তাহলে এই কুড়াল দিয়ে হত্যা করা হয়নি। এর কোন প্রমাণ মেলেনি। অবশেষে অপরাধীকে খুঁজতে পুলিশ লিজির পোষাক আষাক পরীক্ষা করতে গিয়েছিল। কিন্তু সব কাপড় ওলট পালট করেও ধূসঢ় রঙের রক্তমাখা পোষাক পায়নি। সরকারী পক্ষের প্রধান কৌশলী হোসে নোয়েলটন বলেন,

"পুলিশকে প্রভাবিত করেছে লিজি আর এ কারণেই তারা পোষাকটি পায়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা অপরাধী।"

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জানাল,

"লিজি ধূর্ত এবং অপরাধী। সবাইকে মূর্খ বানিয়ে ছেড়েছে।"

এত কিছুর পরও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে লিজি প্রকৃত খুনী। কারণ সেরকম প্রমাণ কোন আইনজীবী হাজির করতে পারেনি। স্বাক্ষ্য প্রমাণে

BanglaBook.org

এটাই নিশ্চিত হয়েছে লিজি খুন করেনি। তাহলে কে খুন করেছে? এটাই বড় রহস্য। রাষ্ট্রপক্ষ খুনীকে খুঁজে বের করতে পারেনি।

পুরো বিচার বিভাগ, গোয়েন্দা সংস্থা এবং পুলিশের কার্যক্রম দেখে হোসে নোয়েলটন অত্যন্ত দুঃখের সাথে মন্তব্য করলেন,

"সব পুরুষ বিচারক নারী বিচারকদের মতই অজ্ঞ এবং নোংরামীর পরিচয় দিয়েছে। মহিলা বিচারকরা যেমন কখনোই সুষ্ঠু বিচার করতে পারে না, তেমনি পুরুষ বিচারক আরো খারাপ।"

তার এ বিশ্বাস মূলত ভিক্টোরিয়ান যুগের কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। সে সময় নারীরা নানারকম সন্ত্রাস ও নির্যাতনের শিকার হয়েও বিচারালয়ে গিয়ে পুরুষ বিচারকদের দ্বারা আরো নির্যাতিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে নারীরা বিচার কার্যে এসে তেমন কিছুই করতে পারেনি বরং জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তার চিন্তা চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিল। নারীর প্রতি তার আজন্ম ঘৃণা সেটাই যেন প্রকাশ করলেন।

এন্ড্রু এবং অ্যাবিকে কে হত্যা করেছে সেটা নিশ্চিত না হলেও এটা তিনি নিশ্চিত কোন মহিলার দ্বারাই খুন হয়েছে। তার মতে এন্ড্রুর বাসার সামনে যে গীর্জা রয়েছে সেই গীর্জার কোন নারী সেবিকার দ্বারাই এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তিনি মৃতদেহের ময়না তদন্তের রিপোর্ট পুনরায় হার্ভার্ড মেডিকেলের কাছে পাঠানোর জন্য আদালতের কাছে প্রস্তাব দিলেন।

হোসে নোয়েলটনের মতে অজ্ঞাত নারী খুন করেছে। খুনী সে মহিলা কোন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং তার উদ্দেশ্য ছিল .... এটুকু বলেই থেমে গেলেন নোয়েলটন। খুনী সে মহিলার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে জোড়া খুন করে তা পূরণ করল। একথা সর্বজন বিদিত, অ্যাবির কোন শত্রু ছিল না। তাহলে লিজিই তার শত্রু। কিন্তু অ্যাবির সাথে এন্ড্রুকেও কেন খুন করা হল?

জুরি বোর্ডের এটা মনে রাখা উচিত অতিথিকক্ষ থেকে নিচে নেমে এসেছিল লিজি। সেখানেই তার মা খুন হয়ে ছিল। নিচে ড্রইংরুমে কিছুক্ষণ বাবার সাথে গল্প করেছে। এন্ড্রু বরডেন যে তার মেয়ে লিজিকে খুব ভালবাসত তা নয়। তাদের মধ্যে বরং অনেক তিক্ত সম্পর্কের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে কি বাবাকে হত্যা করবে সে? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? বলা হচ্ছে, যে কুড়াল দিয়ে সে খুন করেছে সেটি তার বাবার কাছ থেকে নিয়েছিল। আরো একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, লিজি কেন ধূসর রঙের জামা পুড়িয়ে ফেলেছিল? এর উত্তর হতে পারে, বিকল্প কোন পথ খোলা ছিল না তার। কারণ সে জানত পুলিশ আবারও তাদের বাসা তল্লাশী করে পোষাকটি খুঁজতে আসবে। আর সেজন্য অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পোষাকটি পুড়িয়ে ফেলাই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে ভেবেই, তা পুড়িয়ে ফেলে। কোন প্রমাণ রাখতে চায়নি সে। ঝুঁকিও নিতে চায়নি। নোয়েলটনের

BanglaBook.org

এসব কথা শুনে আদালতে উপস্থিত মানুষের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। অনেকেই অবাক হল, জুরি বোর্ড যা বলছে তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করছে না কেন লিজি। সে তাকে রক্ষা করতে নিজের বক্তব্য, পেশ করছে না কেন? নিজেকে রক্ষা করা তার নৈতিক এবং সাংবিধানিক অধিকারও বটে।

নোয়েলটনের বক্তব্য শেষ হল। কিছুক্ষণের জন্য আদালত স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রধান বিচারক তার বক্তব্য শুরু করলেন। জুরি বোর্ডের প্রতি নির্দেশের আগে প্রধান বিচারক বললেন,

"আমি লিজির কাছ থেকে তার বক্তব্য শুনতে চাই। তার বিরুদ্ধে যে এত অভিযোগ আনা হল, সে কিভাবে খণ্ডন করবে? সে কি নিজেকে অপরাধী ও খুনী মনে করে?"

লিজি ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিল,

"আমি নির্দোষ। কোন পাপ করিনি।"

কিছু সময় চুপ থাকলেন বিচারক। তারপর সবকিছু পর্যালোচনা করে বললেন,

"সত্যের সন্ধান করতে হলে জুরি বোর্ডকে অবশ্যই নৈতিক দিক বিশ্লেষণ করে এবং আবেগ অনুভূতি বাদ দিয়ে সুষ্ঠু বিচার করতে হবে।"

আদালত জুরি বোর্ডের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিল। বিচার সভা এক ঘণ্টার জন্য মূলতবী করা হল। পুনরায় আদালত বসলে বিচারক জানালেন,

"যেহেতু লিজির বিরুদ্ধে সঠিক কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই তাই রায় মেনে নিতে হবে।"

বিচারক লিজিকে নির্দোষ ঘোষণা দিল। এ রায় শুনে আনন্দে কেঁদে ফেলল লিজি। উপস্থিত জনতা তাদের বিজয় প্রকাশ করল। তারা উৎফুল্ল হল। বিজয়ের আনন্দে হর্ষধ্বনি দিল। পরেরদিন পত্রিকায় শিরোনাম হল,

'সত্যের জয় হয়েছে।'

লিজি জেল থেকে মুক্তি পেল। দু'বোন লিজি ও এমা ফল রিভারে নিজ বাড়িতে ফিরে এল। বাবার বাড়িতে না থেকে তারা নতুন বাড়ি কিনল। সেখানেই দুই বোন টানা এক যুগ বাস করল। দু'জনেই নিজেদের কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকত।

তারপর একদিন বড় বোন এমা চাকরি ছেড়ে দিয়ে অবসর নিন। নিজের কাছেই তার ক্লান্ত লাগছিল। একঘেয়েমি জীবনে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল এমা। অবশ্য লিজির মধ্যে কোন বিরক্তি ছিল না, বরং সে ঠিকই তার সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। বছরের পর বছর সে একাগ্রচিত্তে তার কাজ করত। ফল রিভারের অনেকেই তাকে সন্দেহ করত সে-ই তার বাবা মায়ের প্রকৃত

BanglaBook.org

খুনী। তাতে অবশ্য তার কিছু যায় আসে না। কারণ আদালত তাকে নির্দোষী বলে রায় দিয়েছে। ফল রিভারে লিজিই প্রথম মহিলা যে গাড়ী কিনেছে। সেই গাড়ী সে নিয়মিত চালাত এবং নিজে ড্রাইভ করে অফিসে যেত। এমনকি সে নিয়মিত বোস্টন এবং নিউইয়র্কে গিয়ে থিয়েটারে মঞ্চ নাটক দেখে আসত।

১৯২৩ সালে রিয়াল এস্টেটের সম্পত্তি নিয়ে আদালত থেকে চিঠি আসে দু'বোনের কাছে। সম্পদের বিরোধ মিটাতে নির্দেশ দেয়া হয় দু'বোনকে। এর অর্থ দাঁড়ায় এন্ড্রু বরডেনের হত্যা কাহিনী আবার পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। আদালতে মামলা উঠবে। ব্যাপক সোরগোল হবে। অবশ্য বুদ্ধিমতি এমা নিখুঁতভাবে বিষয়টি আইনজীবীর সাথে আলোচনা করল। মামলা পর্যন্ত যেতে হয়নি। সুষ্ঠুভাবে সমাধান হল। এরপর নিউ হ্যাম্পশায়ার চলে গেল এমা।

এমার দীর্ঘ ৩৫ বছরের কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। তখন লিজির বয়স ৬৭ বছর। একদিন ফল রিভার হাসপাতালে মৃত্যু হল তার। তার মৃত্যু স্বাভাবিক বলেই চিকিৎসকরা ঘোষণা দিল। এর ঠিক দশদিন পর এমা মারা যায়। দু'বোনের লাশ দাফন করা হয় বাবা মায়ের কবরের পাশেই। ফল রিভার কবরস্থানে পরিবারের সবাই শায়িত রয়েছে। চির নিদ্রায় রয়েছে তারা।

মৃত্যুর পরও অনেকেই লিজির কথা মনে রেখেছে। তার কর্মময় জীবন ছিল বৈচিত্রময়। চিরকাল সে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার সমুদয় সম্পদ শরণার্থী এবং দারিদ্র এবং মানব কল্যাণে ব্যয় হয়।

একটা বিষয় সন্দেহ থেকেই যায় লিজি কি সত্যি শান্তিতে মৃত্যুবরণ করেছে? বিচারকরা তাকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছে। কিন্তু সে কি সত্যিই নির্দোষী? তাহলে অপরাধী কে? সে রহস্য কখনো উন্মোচিত হয়নি। কখনোই জানা যাবে না। এ রহস্য কখনো প্রকাশ পায়নি, অস্পর্শই থেকে গেছে চিরকাল।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org